মাঘ, ১৩২৮

শান্তি নিকেতন

সম্পাদক
শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

তৃতীয় বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য,
ডাক মাশুল সহ ১।৹ টাকা

মাঘ, ১৩২৮

শান্তিনিকেতন

তৃতীয় বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক
শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

বার্ষিক মূল্য,
ডাক মাশুল সহ ১॥৹ টাকা

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

বর্ষ | মাঘ, সন ১৩২৮ সাল। | ১ম সংখ্যা।

ভূমিকা।

দের আশ্রমের ছাত্র এবং আত্মীয় স্বজনের সংখ্যা ...হিরে বিস্তৃত হইতেছে। আমাদের পরস্পরের ...ং আমাদের এই আশ্রমের সহিত সকলের যোগ ... একটি পত্রিকার অভাব আমরা বারম্বার অনুভব ...। তাহারই ফলে আশ্রমিক সংঘের তরফ হইতে ...টি বাহির করা হইল।

...নবের স্বরূপ এবং গভীরতর ঐক্যটি উপলব্ধি ...রা অশ্রমে প্রতি দিনই সহজ হইয়া আসিতেছে। ...হইতে নানা জাতির সেই সকল ব্যক্তিরা আজ ...সিতেছেন যাঁহারা এই নব যুগের বাণী গভীর ...য়ের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আশ্রমের ...দেশ ...লাপ আলোচনা অধ্যয়ন এখানকার ...র সতি দূরে কর্ম্ম ক্ষেত্রে গিয়াও আমাদের ...টুক ঐ কামনা লইয়া আমরা কার্য্য ক্ষেত্রে ...তেছি।

বিশ্বভারতীর পরিষদ-সভার

প্রতিষ্ঠা

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর, ৮ই পৌষ বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমের আম্রকুঞ্জে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন শিক্ষার কেন্দ্র বিশ্বভারতীর সাম্বৎসরিক সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর জন্য যে সংস্থিতি (constitution) প্রণীত হইয়াছে তাহা গৃহীত হয়। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্য, সিলভ্যাঁ লেভি, ম্যাডাম লেভি, রাজগুরু ধর্ম্মাধার মহাস্থবির, ডাক্তার মিস ক্রামরিশ, শ্রীযুক্ত উইলিয়মস্ পিয়ার্সন, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী, শ্রীমতী প্রতিমাদেবী, শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায়, স্যর নীল রতন সরকার, দিল্লীর সেন্ট ষ্টিফেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত এস্ কে রুদ্র, শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র ঠাকুর, শ্রীযুক্ত ... চন্দ্র মহালানবিশ, ডাক্তার শিশির কুমার ... বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

স্থানে শান্তিনিকেতন আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক আলপনার দ্বারা চিত্রিত করা হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ডাক্তার ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব উপস্থিত করেন এবং তদুপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা

আজ বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছু দিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে আজ সর্ব্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পন করে দেব। বিশ্ব-ভারতীর যাঁরা হিতৈষিবৃন্দ ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন আজ এখানে ডাক্তার শীল, ডাক্তার সরকার এবং ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরো সৌভাগ্য যে সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন যাঁর খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্ম্মে যোগদান করতে আচার্য্য পরম সুহৃদ সিলভাঁা লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্যদেশের প্রতিনিধিরূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে ইঁহার চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যে সকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা ...দের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে ...দিন লালন পালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে ...য় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন ... এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য্য শীল মহাশয়কে ... সম্মতিক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহ... কর্ম্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধিরূপে আমাদের ... থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। ... এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ প... না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন ... অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না ... অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ঘটে। কিন্তু ... আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ ... ছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ ক... যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে ... সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সাম... উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থা... নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার ... সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

বিশ্বভারতীর মর্ম্মের কথাটি আগে বলি, কারণ ... হয়তো ভাল করে তা জানেন না। কয়েক বৎ... আমাদের পরম সুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের ম... হয়েছিল যে আমাদের দেশে সংস্কৃত শিক্ষা যা... তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তার সাধন ... তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে আমাদের দেশে ... পাঠীরূপে যে সকল বিদ্যায়তন আছে তার ... প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল ... আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের ... কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের পরি... বর্ত্তমানে গবর্মেণ্টের দ্বারা যে সব বিদ্য... হয়েছে সে গুলি এই দেশের নিজের স্... আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ... বিদ্যালয় গুলির মিল আছে, এরা আমাদে... এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে চন... তার আহ্বান প্রকাশ পাওয়া; না যদি প্রত্যে...

তৎপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাক্তার শীল মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহাকে আশ্রমের পক্ষ হইতে পুষ্পচন্দনের দ্বারা বরণ করা হইল। তিনি আসন পরিগ্রহ করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত এবং অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন নিম্নে দেওয়া হইল।

ডাক্তার শীলের বক্তৃতা

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হ'ল, তাহা আমি শিরোধার্য্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণঅযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হ'লাম। বহুবৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরণের educational experiment দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল' এর মত দু'একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত, এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘ-রৌদ্র-বৃষ্টি-বাতাসে বালকবালিকারা লালিত পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ প্রকৃতির আবির্ভাব নয়,—কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালকবালিকারা এক পরিবার ভুক্ত হয়ে আচার্য্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ personality এখানে সর্ব্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনি ভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র ভাষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আরেকটি ধ্বনিগত অর্থও আছে;—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে [illegible] করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে, আবার সেই প্রা[illegible] বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতী নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহ[illegible]ণ কোন্‌টা? যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে, তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপনও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। "Each can realise himself only by helping other as a whole to realise themselves এ যেমন সত্য এর converse অর্থাৎ "Others can realise themselves by helping each individual to realise himself" ও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্ত্তী তেমনি আমিও তার মধ্যবর্ত্তী; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এভাবে দেখতে গেলে বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কি তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্ব্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে, সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম, দেবালয় প্রভৃতি যা কিছু হয়েছিল, তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা order progress-কে মানে না, reform চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড় যুদ্ধ চলে আসছে। গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে? সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কি বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এতকালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যাপূরণ করবার কি[illegible]

...ড়া দিচ্ছে না মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি ...জের গ্রামে যান; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখন-...র মত বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম। যদিও আমি ...নতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে ...রে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে ... স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম। তাঁর ইচ্ছা সাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনি ভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতিলাভ করে সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবী সমস্ত বিশ্বের,—তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব্বমহাদেশ কি সম্পদ দিতে পারে, তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্ম্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে; তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও একথা বুঝতে পেরেছেন এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব ... হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

...কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশতঃ আপন ...র্ম্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে, তবে সেই অহঙ্কারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহঙ্কারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে যাচ্ছে, ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে মানবের বড় অভিপ্রায়কে ...থে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হ'ব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সঙ্কীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সব চেয়ে বড় গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও এ'কে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কি আছে? কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কি দান করবে? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এই জন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

আমি ইচ্ছা করি আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাশয় কিছু বলুন। আমাদের কি কর্ত্তব্য—এই বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর চিত্তের যোগ কোথায়, তা আমরা শুনতে চাই। আমি এই সুযোগ গ্রহণ করে আপনাদের অনুমতি ক্রমে তাঁকে সভাপতির পদে বরণ করলুম।

তাঁহার বক্তৃতার পর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় অধিষ্ঠাতা আচার্য্য মহাশয়ের প্রস্তাবটির অনুমোদন করেন। তিনি বলেন যে—

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে গুরুদেব যা বল্লেন, তাকে প্রকাশ করার জন্য উপনিষদের একটি বাক্য আমরা গ্রহণ করেছি, 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্', "যেখানে বিশ্ব একনীড়ে বাস করে"। বিশ্বভারতীর প্রধান কথা এই যে বাহিরের বিশ্ব সেখানে পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে। বাহির ও ভিতর এ দুয়ের সামঞ্জস্য না হলে যথার্থ কল্যাণ হয় না, শান্তি লাভ করা যায় না। হয় তো কেউ মনে করতে পারেন যে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে একথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাহিক দিক দিয়েও এ সত্যকে উপলব্ধি করতে বলা হয়েছে, একথার মধ্যে এই গূঢ় ভাব নিহিত আছে। আমরা যেন সকলে... সঙ্গে মিলিত হতে পারি। এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য শীল মহাশয়কে সভাপতিত্বে বরণ করবার যে প্রস্তাব কর... হয়েছে তা আমি আনন্দে ও সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন কর...

কিনা? ইয়োরোপে এসম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটি-ক্যাল অ্যাডমিন্‌স্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর "treaty" "convention" "pact" এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে; এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে Multiple Alliance হয়েও হ'ল না, বিরোধ ঘটল। Arbitration Court এবং Hague Conference এ হল না, শেষে League of Nations এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে এ ছাড়া আরো অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে, কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations এর জন্য নূতন humanisim এর religious movement হওয়া উচিত। তার ফলস্বরূপ যে machinery হবে তা পার্লামেণ্ট বা cabinet এর diplomacyর অধীনে থাকবে না। পার্লামেণ্ট সমূহের joint sitting তো হবেই, সেই সঙ্গে বিভিন্ন people এরও conference হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিষ আবশ্যক হবে mass এর life;mass এর religion। বর্ত্তমান কালের কেবল মাত্র individual salvationএ চলবে না, সর্ব্ব মুক্তিতেই এখন মুক্তি,না হ'লে মুক্তি নেই। ধর্ম্মের এই mass life এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কি বাণী হবে? ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীনদেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peaceহবে, নয় তো হবে না। কনফিউসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক fellowship এর উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয়, তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আরেকটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে,— তা হচ্ছে অহিংসা, মৈত্রী, শান্তি। প্রত্যেক individual এ [illegible]ন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা, এই ভাবের মধ্যে যে Peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace, compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীন দেশের social fellowship এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অফ্‌ নেশনে কিছু হবে না। Great warএর থেকেও বিশালতম যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে State আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্ম্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্ম্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationality তে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অফ নেশন এর nationalityর ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the world স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অফ্‌ নেশনে এই extra territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিতসাধন করতে পারবে ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্ব্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে—রাজচক্রবর্ত্তী হয়েও—এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের message কি? আমাদের এখানে group ও communityর স্থান খুব বেশী। এরা intermediary body between state and individual. রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে state

ও individualএ বিরোধ বেধেছিল ; শেষে individualism এর পরিণতি হল anarchyতে, এবং state, military socialism এ গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে, বর্ণাশ্রমে এবং ধর্ম্মসংঘের ভিতরে communityর জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্দ্ধারিত কর্ত্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual যেমন আছে, তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে group personality এবং individual personality জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। Group personalityর ভিতর individual এর স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের individual personalityর বিকাশ হয়নি, co-ordination of power in the state ও হয়নি। আমরা individual personalityর দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ব্যূহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

আজকাল ইয়োরোপে group principleএর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization এ সবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যা পূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন ইউরোপের কাছ থেকে State এর centralization ও organization নেবার আছে তেমনি ইউরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organization কে গ্রহণ করে আমাদের village community কে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralization এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সে জন্য বলছি না যে town lifeকে develop করতে হবে না, তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownership এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবন ও দরকার আছে কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual ownership এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large scale production আনতে হবে। বড় আকারে energyকে আনতে হবে কিন্তু দেখতে হবে কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায় প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনি ভাবে economic organization এ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের standard of life এত নিম্ন স্তরে আছে যে আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organization এর নির্দ্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজন সাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই রাষ্ট্রনীতি:সমাজধর্ম্ম ও অর্থনীতির যে যে institution পৃথিবীতে আছে সে সবকেই study করতে হবে এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকেও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে-ঢেলে নিতে হবে ; আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির Scheme of life আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও একজায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environment এর জন্য যে:life values সৃষ্ট হচ্ছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই life schemes গুলির আদান প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরী হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কি কি অভাব আছে, কি কি আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে? আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে আমরা বড় একপেশে, emotiona[illegible]

ভিতরে will ও intellect এর মধ্যে, subjectivity ও objectivityর মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব subjective নয় তো খুব universal। অনেক সময়েই আমরা universalisim বা সাম্যের চরম সীমায় চলে চাই, কিন্তু differentiation এ যাই না। আমাদের objectivityর পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ ও observation এর ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্ত্তিতাকেও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellect এর character এর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের [illegible]tellectual honestyর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে; হলেই দেখব যে কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। [illegible] দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে; law, justice ও equalityর যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে এসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এদেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardised [p]roduct তৈরী হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalnessএর [স্থ]ান হয়েছে, আশাকরি বিশ্বভারতীতে সেই spontanietyর [ব]িকাশের দিকে দৃষ্টি থাকে। Universityকে জাতীয় [প্র]তিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এসিয়ার genius, universal [h]umanism এর দিকে, অতএব ভারতের এবং এসিয়ার [i]nterestএ এরূপ একটি Universityর প্রয়োজন আছে। [পূ]র্ব্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা [স্থা]পন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই [সনা]তন আরণ্যককে বিশ্বভারতীরূপে এখানে পত্তন করা হইল যে বিশ্বভারতী পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হউক এবং নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ ইহার প্রথম সভ্যরূপে গণ্য হউন" :—

১। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ২। আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি, ৩। ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, ৪। প্রিন্সিপাল সুশীলকুমার রুদ্র, ৫। ধর্ম্মাধর রাজগুরু মহাস্থবির, শ্রীযুক্ত,—৬। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৭। বিধুশেখর শাস্ত্রী, ৮। জগদানন্দ রায়, ৯। ক্ষিতিমোহন সেন ১০। নন্দলাল বসু, ১১। প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশ, ১২। নেপালচন্দ্র রায়, ১৩। ফণীভূষণ অধিকারী ১৪। ভীমরাও শাস্ত্রী, ১৫। অসিতকুমার হালদার, ১৬। উইলিয়মস পিয়ার্সন, ১৭। সি এফ অ্যাণ্ড্রুজ, ১৮। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯। সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, ২০। সুরেন্দ্রনাথ কর, ২১। গৌরগোপাল ঘোষ, ২২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২৩। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪। তেজেশচন্দ্র সেন, ২৫। নগেন্দ্রনাথ আইচ, ২৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি।

এই উপলক্ষ্যে ডাক্তার সরকার মহাশয় বলেন—

আজ পশ্চিম দেশেও হাহাকার পড়ে গেছে—প্রচলিত শিক্ষায় মানবত্বের বিকাশ হল না। ধন লালসার ভিতর দিয়ে জাতির অবনতি দেখে সে দেশের চিন্তাশীলেরা নিরাশ হয়েছেন। তাঁরা আজ পূর্ব্বের দিকে চেয়ে আছেন—সেখান থেকে এদিক দিয়ে কি আশ্বাসবাণী পাওয়া যায়। কে কত মানুষকে দাস রূপে পরিণত করতে পারে, কে কত দেশ অধিকার করতে পারে পশ্চিমে তার প্রতিযোগিতা চলছে এই ব্যাপার দেখে একটি কথা মনে পড়ে। কম্বোডিয়া এক সময়ে বাংলাদেশের অধীন ছিল। সে দেশবাসীরা ভারতবর্ষ থেকে নানা শিক্ষা লাভ করলেন। তাঁদের মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হল; যখন তাঁরা স্বাধীনতার কামনা করলেন, তখন আমাদের পূর্ব্ব পিতামহরা কামান বন্দুক দিয়ে আট ঘাট বাঁধার চেষ্টা না করে, আনন্দের সঙ্গে বল্লেন—"তথাস্তু!"—এ শিক্ষা আমাদের পৃথিবীকে দেবার আছে।

ভবিষ্যতে বিশ্বমানবের অভিব্যক্তির জন্য কি প্রয়োজন

[ডাক্তার] স্যর নীল রতন সরকার মহাশয় প্রথম [স]ভায় উপস্থিত করেন। প্রস্তাবটি এই "স্থির

হবে তার সম্পূর্ণ ধারণা করা আজ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়—কিন্তু মানবের কল্পনা যতদূর যেতে পারে ততদূর পর্য্যন্ত ভেবে একটা ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্যকে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে তার সংস্থিতিকে যথাসম্ভব ব্যাপক করা হয়েছে—আশা করে যেতে পারে ভবিষ্যতের বৃদ্ধির পথে এ সংস্থিতি অন্তরায় হবে না।

উক্ত প্রস্তাব বিশ্বভারতীর ইতিহাসাধ্যাপক ফরাসী পণ্ডিত মসিয়র সিলভ্যাঁ লেভি অনুমোদন করেন এবং শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীমতী স্নেহলতা সেন, মিষ্টার উইলিয়াম পিয়ার্সন এবং শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমর্থন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন।

"স্থির হইল যে নিম্নলিখিত সংস্থিতি গৃহীত হউক; আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অধিষ্ঠাতা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লইবেন।"

এই প্রস্তাব প্রিন্সিপাল এস্ কে রুদ্র মহাশয় অনুমোদন করেন। তিনি বলেন,—"শান্তিনিকেতনে এসে আমার মনে হয় নিজের জায়গাতেই এসেছি। এখান থেকে গিয়ে যখন দিল্লীর কাজে যোগদান করি তখন দুটি জিনিস আমাকে চেপে ধরে, সরকার এবং আমার ধর্ম্ম সম্প্রদায়। এখানে এসে আমি নূতন জিনিস দেখতে পাই, আমাদের যা যথার্থ সম্পদ তা মরে নি। কিন্তু এটি গুরুদেবের শক্তির প্রভাবে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের যিনি স্থাপয়িতা তাঁর প্রাণের ঐশ্বর্য্য একে নূতন প্রাণ দিয়েছে। এখানকার বাণী সমস্ত পৃথিবীতে যেতে পারবে সে কথা আজ আবার নূতন করে উপলব্ধি করছি। সাধনার দ্বারাই আমরা আমাদের নিজের অধিকারকে ফিরিয়ে আনতে পারব। আমি এই প্রস্তাবটি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি।

রুদ্র মহাশয় ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিলে অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ মহাশয় তাহা সমর্থন করেন।

ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র মহাশয় চতুর্থ প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন:—

"স্থির হইল, যে অধিষ্ঠাতা-আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে ১২, ২৩ ও ২৬ ধারানুযায়ী প্রথম তালিকা প্রস্তুত করিবার এবং কর্ম্মসমিতি ও শিক্ষাসমিতির প্রথম বর্ষের সভ্য নিযুক্ত করিবার ভার অর্পণ করা হউক।"

শিশির বাবু প্রস্তাব উপস্থাপন কালে বলেন "যিনি এই বিশ্বভারতীর প্রাণস্বরূপ তাঁকে এই যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এ তো অতি সামান্য। আমরা তাঁর স্বভাব জানি। ত্যাগই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র তিনি প্রভুত্ব ভাল বাসেন না। তিনি আশ্রমকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছেন।" উক্ত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় অনুমোদন এবং শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় সমর্থন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন "ডাক্তার শীল মহাশয়ের জ্ঞানের কাছে কেবল আমাদের দেশ নয়, সমস্ত বিশ্ব ঋণী। তিনি আমাদের গৌরবের সামগ্রী, আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা তাঁকে পেয়েছি।"

পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। লেভি সাহেবকে ধন্যবাদ প্রদান কালে তিনি বলেন—"অধ্যাপক মহাশয়কে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আমার আহ্বান স্বীকার করে তিনি ভারতবর্ষে এসেছেন। এ দেশের জন্য তাঁর অকৃত্রিম প্রেম। যে কোনো ভারতীয় ছাত্র বিদেশে তাঁর কাছে গেছে তাঁর প্রেমে তার চিত্ত অভিষিক্ত হয়ে গেছে। তারা ইঁহার মুখে ভারতের অশেষ গুণগান শুনেছে, ভারতের প্রতি তাঁর প্রেম কিরূপ জানতে পেরেছে। তিনি বহুদূর থেকে দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করে এদেশে এসেছেন। আমেরিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যাবার কথা ছিল। তিনি সেই সম্পত্তিশালী দেশের আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে আমাদের আশ্রমে—আমরা বাহ্যসম্পদে সে দেশের চেয়ে অনেক দরিদ্র

বছরের মধ্যে বড় চিত্রকরদের মধ্যে স্থান পান এবং
sen নামক একজন চিত্রকরের অধীনে একটি বড়
চিত্রকার্য্যের সহায়তার জন্য আহুত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ
র একটি ছবির সমালোচনা করার দরুণ yusen
দলচ্যুত করেন তারপর তিনি অনেক চিত্রকরের অধীনে
রেন কিন্তু কারও তিনি বেশী দিন থাকতে পারতেন
বং প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সময়ই তাকে নাম পরিবর্ত্তন
রতে হত। ১৭৯৯এ তিনি হকুসাই নামে নিজেকে
লাতে লাগলেন এবং এই নামেই আমরা তাকে চিনি।
র সুনাম তখন ধীরে চারিদিকে ছড়াচ্ছিল। তার স্বাধীন
র একটি ঘটনা এখানে উদ্ধৃত করছি একটি ডাচ
র কাপ্তান ও ডাক্তার দু খানা ছবি হাকুসাইকে এঁকে
দিতে বলেন। হাকুসাই ছবিগুলোর জন্য খুব একটু উঁচু
দাম হেঁকে বসল কাপ্তান কিন্তু বিনা বাক্য ব্যয়ে ছবিখানা
কিনলেন কিন্তু ডাক্তার মহাশয় ছবির জন্য অর্দ্ধ মূল্য দিতে
াইলেন হাকুসাই নিজেকে অপমানিত বোধ করে ছবি বিক্রী
রতে অস্বীকৃত হয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। বাড়ীতে
র স্ত্রী তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন "এতটা বাড়াবাড়ী
মার ভাল হয়নি আমরা গরীব আমাদের টাকার দরকার
মদের এ রকম করলে কি করে চলবে?" কিন্তু
কুসাই উত্তর দিলেন "আমি জাপানীদের কথার মূল্য রেখেছি
ক কথায় আর এক কাজ করা আমাদের ধর্ম্মনয় এটা
দের জানা উচিত।" কিন্তু কাপ্তান সাহেব এ সব খবর
তে পেয়ে নিজেই সে ছবিটাও কিনে নিয়েছিলেন।
জীবনে অনেক অদ্ভুত চিত্রকার্য্য করেছেন। তিনি
রের জন্য এত বড় একটি ছবি এঁকেছিলেন যে
থেকে তার কিছুই বুঝতে পারেন নি, মন্দিরের
তারা ছবিটা ঠিক দেখতে পারেন। অথচ ছবি-
ন অল্প কয়েক মিনিটে শেষ করেছিলেন। রাস্তার
হ'য়ে তাঁর অদ্ভুত তুলি চালনা দেখছিল, হকুসাই
আলোড়িত করে ছবিখানা অতি অল্প
রকম অনেক বড় বড় ছবি

তিনি করেছিলেন যাতে তার ক্ষমতার পরিচয় আমরা
পাই। তিনি একদিকে যেমন এত বড় ছবি করেছিলেন
অন্যদিকে আবার তিনি এত ছোট ছবিও করেছিলেন—যে
শুধু চোখে তা দেখা বড় কষ্ট কর। তিনি যে কোন জিনিষে
যে কোন সরঞ্জাম এ ছবি আঁকতে পারতেন। Figure এর
ছবি নীচ থেকে উপর দিকে উপর থেকে নীচে দিকে আশ্চর্য্য
ক্ষমতার সহিত এঁকে যেতে পারতেন। এবং এই অসাধারণ
ক্ষমতার সহিত তার কল্পনাশক্তির নিতান্ত যোগ থাকার
জন্যই তিনি সর্ব্বসাধারণের এত প্রিয় হতে পেরেছিলেন।
তার সুনাম যখন প্রত্যেকের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল
তখন জাপানে সম্রাট তাকে রাজসভায় একটি ছবি আঁকবার
জন্য ডেকে পাঠান। হকুসাই একখানা Screen এ একটি
নীল নদী এঁকে একটি মুরগীর পায় লাল রং লাগিয়ে তার
উপর ছেড়ে দেন। মুরগী উপর দিয়ে চলে যাওয়ায় সেই
নীল নদীর উপর লাল পায়ের দাগ ফেলে যায়। যখন সেই
ছবিখানা রাজার সামনে ধরা হ'ল তিনি দেখলেন তিতস্রুতা
নদীর উপর দিয়ে শরতের রঙীন Maple পাতা ভেসে
চলেছে। এই ছবিখানাতে তিনি রাজসভায় খুব প্রশংসা
পেয়েছিলেন। হকুসাই একজন লেখকের সঙ্গে একযোগে
বইএর জন্য ছবি আঁকতে থাকেন কিন্তু প্রথম অধ্যায় বের
হবার পরই দুজনে ঝগড়া হয়ে সমস্ত কাজ বন্ধ হয়ে যায়।
তারপর তিনি অনেকবার yedo থেকে অন্য জায়গায় অদৃষ্টের
তাড়নায় বেরুন কিন্তু আবার yedoতে ফিরে আসেন। ১৮০৬
যখন তিনি yedoতে ফেরেন তখন চারিদিকে দুর্ভিক্ষ তিনি
তার Sketch এবং অনেক ভাল ভাল ছবি অতি অল্প মূল্যে
বিক্রী করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন কিন্তু বিধাতা তাঁকে
আরও কষ্ট দিলেন তার বাড়ীতে একদিন আগুন লেগে সমস্ত
পুড়ে গেল তার অসংখ্য ছবি ও Sketch নষ্ট হওয়ার জন্য
পৃথিবীর অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। হকুসাই শুধু তার তুলি আর
একটি ভাঙ্গা জলের পাত্র বাচাতে পেরেছিলেন কিন্তু তিনি তাই
নিয়েই আবার নতুন উৎসাহে কাজে লাগলেন দারিদ্র্যের সঙ্গে
তার ল... অনেকদিন চলল কিন্তু তাতে কখনও

হারায় না ভাই কিছুই তবে
রবার যা তা রবেই,
হয়ত নূতন বেশে!
যাওয়া-আসার স্রোতের পরে
চল্‌ছি ভেসে সবেই
অজানা কোন্‌দেশে!
স্বপ্ন যত, ভালোবাসা,
ব্যাকুল বুকের আকুল আশা,
চেনার আড়াল পেরিয়ে তা'রা
গোপন প্রাণেই মেশে।
তারা সকল সমাপনের দিনে
আপন কথা কবেই
যাওয়া-আসার স্রোতের পরে
চল্‌চে ভেসে সবেই
অজানা কোন্‌দেশে!
হারায় না ভাই কিছুই তবে
রবার যা তা রবেই
হয়ত নূতন বেশে!

শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

হকুসাই

১৮শ শতাব্দিতে জাপানে একটা সময় এ'ল যখন চিত্রকরর' সমাজের সাধারণ ছবি আঁকতে সুরু করলেন। এবং সে সকল ছবি wood block print করে বাজারে সর্ব্বসাধারণের জন্ম বিক্রী হতে লাগল। বিলাতে কি অন্য অন্য জায়গায় তথনও আর্টকে popular করবার চেষ্টা এমনভাবে হয়নি কিন্তু জাপানে তথন বড় বড় ... যাতে ছোট থাট জিনিষ সুন্দর হয়ে সমস্তের ঘরে ঘরে পারে। এই চিত্রকরদের ukieoye চিত্রকর ব নানা রকমের চিত্রকর ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠতে লাগ কেউ রইলেন সমস্ত জীবন অভিনয়ের বড় বড় অভিনে চিত্র, এবং তার নানাপ্রকার দৃশ্যাবলী নিয়ে এবং রূপসীদের প্রেমের খেলা মান অভিমান বিদায়, বি উৎসব, নাচের ছবি নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। এবং কেহ মানুষের ঘরের, বাইরের খবর, গাছপালা পাহাড়, নদী, সবই ভাল করে দেখে শুনে গল্পের জন্য আঁকতে লাগিলেন এই ukieye যুগে হকুসাই জন্মেছিলেন তার অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে—জাপানের Yedo নগরীতে।

ছেলে বয়স থেকেই তার নিজের ভাবনা নিয়ে ভাবতে হ'ল। প্রথমে তিনি দু একটা বইএর দো কাজে লাগলেন। কিন্তু ভয়ানক অলস বলে তার কা জবাব হ'ল। তিনি তখন ভাবলেন তার দ্বারা দোকানে কাজ—হবার নয়। কাঠ খোদাই বিদ্যা শিখ্‌তে পারলে জীবিকা অর্জ্জন করা শক্ত হ'বে না মনে করে তিনি এক গুরুর কাছে উপস্থিত হলেন কাঠ খোদাই শিখ্‌তে কিছুদিন পর তিনি কাঠখোদাই ছেড়ে আর এক গুরু নিকট চিত্রবিদ্যা শিখ্‌তে আরম্ভ করলেন। তখন তাঁ বয়স ১৮ বৎসর। অল্পদিনেই তিনি গুরুর প্রিয়পাত্র হয়ে গুরুদত্ত নাম ছবিতে ব্যবহার করতে লাগলেন। এই ভাবে কিছুদিন যাবার পর তাঁর গুরুর পদ্ধতিতে সন্তুষ্ট ন হয়ে অন্য পদ্ধতিতে ছবি আঁকতে লাগলেন। এই ব্যাপা তার গুরু এত অসন্তুষ্ট হলেন যে তিনি তার দেও ব্যবহার করতে নিষেধ করে তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন

অনেক দিন অনেক কষ্ট স্বীকার করে রাস্ত ঘুরে ঘুরে calender এবং নানাবিধ জিনিষ বিক্রী ... তাঁর কোন রকমে দিন চলছিল না এমন সময় তিনি কাজ পেয়েছিলেন যাতে তিনি কিছুকালের জন্য নির্ ... পেরেছিলেন।

১৭৮৯ সালে তিনি অনেক কষ্ট

আজ শান্তিনিকেতনে যে ত্যাগের ভাব দেখিতেছি তাহা এইরূপ কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে জলন্ত ত্যাগের উদাহরণ শান্তিনিকেতনের কি ছাত্র কি অধ্যাপক কি দর্শককে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা আর একদিকে কর্ম্মীরই উদাহরণ। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বাংলার গৌরব, ভারতবর্ষের এবং জগতের গৌরব কবি রবীন্দ্রনাথ একজন প্রকৃষ্ট কর্ম্মী—এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইতে সকল কর্ম্মেই তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কবির সহিত এই আশ্রমকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবনে আমরা একাধারে ত্যাগ ও কর্ম্মনিষ্ঠার অধিষ্ঠান দেখিতে পাই। প্রত্যেক ছাত্রটীও এখানে ত্যাগ ও কর্ম্ম উভয়ের মিলন নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করে। ভোগ বিলাস ত্যাগ করিয়া কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ না করা ইহাদের পক্ষে কঠিন।

একাধারে এই ত্যাগ ও কর্ম্মের সমাবেশে আশ্রমটি এমন শান্তিময় হইয়াছে। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"— ভোগের আশা মনে না করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। এই রূপ কর্ম্ম যতদূর শাখা প্রশাখা মণ্ডিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, ততই মঙ্গল। অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল—সমাজনীতি, এবং সামাজিক জীবনেরই একাংশ মাত্র যে রাষ্ট্রনীতি, ছাত্রদের পক্ষে তাহার চর্চ্চা একেবারেই বর্জ্জনীয়। আমার মনে হয় এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। এই আশ্রম-বিস্তারতনের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রাণ স্বরূপ কবি রবীন্দ্রনাথও এ ধারণা পোষণ করেন না। সেইজন্যই এই আশ্রমে এত স্বাধীন চিন্তা আমরা দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে কোনও প্রতিবন্ধকতাই তিনি রাখেন নাই। মানব প্রকৃতি যে বিশ্বনিয়মের অনুবর্ত্তী, তাহা ইংরাজের শাসন মানে না, সমাজরক্ষকের শাসনও মানে না। যাহা স্বাভাবিক যাহা নৈসর্গিক তাহাকে জোর করিয়া বদ্ধ করিতে গেলেই তাহা চতুর্গুণ শক্তিতে বাধা ঠেলিয়া অস্বাভাবিক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। শান্তিনিকেতনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ত্যাগ আছে বলিয়াই ত্যাগ এবং সংযম এখানকার ছাত্রদের মজ্জাগত। সমাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সেইজন্যই এত স্বাভাবিক ভাবে তাহারা আলোচনা করিতে পারে, এ সকল হইতে কোনও অনিষ্ট তাহাদের ঘটে না।

আমি এই মাসের "Calcutta Review" এ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে কবি রবীন্দ্রনাথের মূল মন্ত্র হইতেছে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব, humanity in its totality। এই মূল মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। এই শান্তিনিকেতনেও তাহারই উদাহরণ দেখিতে পাই। এখানে সর্ব্বাগ্রে এই কথাই মনে হয়, এখানকার ছাত্রজীবন কলিকাতার ছাত্রজীবনের তুলনায় কত বেশী পূর্ণ। বহুমূল্য অট্টালিকা, সাজসরঞ্জাম সত্ত্বেও এখানকার তুলনায় সে জীবন রিক্ত।—সমবায় বোধ (corporate feeling) সেখানে কতই কম, অন্য ছেলেদের সুখ দুঃখ সেখানে কয়জনের নিকটেই বা বাস্তব বলিয়া প্রতিভাত হয়।—কিন্তু এখানে সকলেই পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ—সে বন্ধন সুধু একত্র বাসের বন্ধন নহে আশ্রমের প্রত্যেক গাছটি প্রত্যেক গৃহের প্রত্যেক ইষ্টকটির সহিত তাহাদের একটী নাড়ীর টান আছে। ইহাদের সব চিন্তা বই এর পাতার মধ্যে আবদ্ধ নহে, দেশের এবং দশের কথা ইহারা চিন্তা করে, social service এখানকার ছাত্রজীবনের একটি অঙ্গ।—Co operative movement এখানে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। আশা করা যায় নবাগত Mr. Elmhirst এর চেষ্টায় ইহা আরও পল্লবিত হইয়া উঠিবে। কৃষিশিক্ষার এখানে বিশেষ আয়োজন চলিয়াছে। সঙ্গীত ও কলাবিত্তার শিক্ষা এই আশ্রমের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা ইহাদের জীবনকে যে স্ফূর্ত্তি এবং পূর্ণতা দিতেছে, অন্যত্র তাহা দেখা যায় না

আজ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা এখানে হইল। যে আদর্শে শান্তিনিকেতন এতদিন চালিত হইয়াছিল সেই আদর্শ বিশ্বভারতীও গ্রহণ করিল। সমগ্র জগৎ নূতন আলোক পাইবার আশায় এই বিশ্বভারতীর দিকে তাকাইয়া আছে—

কেননা যে ভাবে এই শান্তিনিকেতন এতদিন চালিত হইয়াছে তাহাতে এই বিশ্বভারতীর নিকট হইতেই আমরা সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারি যাহা আমাদিগকে অসৎ হইতে সতে, তমঃ হইতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইতে পারে।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পরে আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন রচিত "মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ" গানটি গীত হইলে সভাভঙ্গ হয় এবং সকলে আশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া "আমাদের শান্তিনিকেতন" গান করেন।

৮ই বৈকালে পুরাতন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের sports হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীবিনায়ক মাসোজী (বিশ্বভারতী) শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (প্রাক্তন) ও শ্রীঅতুল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমান) বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সাঁওতাল বনাম আশ্রমের tug of war এ সাঁওতালগণ এবং সাঁওতাল বনাম প্রাক্তনদের tug of war এ প্রাক্তনগণ জয়ী হইয়াছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা নাট্যশালায় প্রধানতঃ প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে "বিসর্জ্জন" নাটকটি এবং সংস্কৃত "বেণীসংহারের" কিয়দংশ অভিনীত হইয়াছিল। প্রধান পাত্রগণের অংশ নিম্নলিখিতরা লইয়াছিলেন :—গোবিন্দ মাণিক্য শ্রীসন্তোষ চন্দ্র মজুমদার. নক্ষত্ররায় - শ্রীসরোজ রঞ্জন চৌধুরী, রঘুপতি শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জয়সিংহ ও অশ্বত্থমা (বেণীসংহার)— শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। সকলেরই বিশেষতঃ রঘুপতির ও অশ্বত্থমার অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। বিসর্জ্জনের জনতার দৃশ্যগুলি সরোজরঞ্জন, বিশ্বভারতীর ছাত্র শচীন্দ্র কর প্রভৃতি খুব জমাইয়া তুলিয়াছিলেন। অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়ের দরুণ মোট ৭ ॥০ টাকা আদায় হইয়াছিল। তাহা প্রাক্তনছাত্রদের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান ছাত্রগণ বিনা টিকিটেই অভিনয় দেখিয়াছিল।

আশ্রম-সংবাদ

গত শ্রাবণ মাসের প্রথমে বিদেশ হইতে গুরুদেবের আশ্রমে প্রত্যাগমনের পর হইতে নানা দিকে কর্ম্মস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর সংস্থিতি সংগঠন ছাড়া বহুবিধ কার্য্যে জড়িত থাকিয়াও গুরুদেব আশ্রমের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিয়াছেন। প্রায় প্রতি দিনই সন্ধ্যার সময়ে সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কিছু না কিছু পড়িয়া তিনি শুনাইয়াছেন এবং তাহার পর সে সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হইয়াছে। সম্প্রতি কিছুদিন হইতে এই সময়ে "বলাকা" কাব্যগ্রন্থ পড়া হইতেছে। এই সূত্রে কবিজীবনের নানা অভিজ্ঞতা, ছন্দ প্রভৃতির মূলগত তাৎপর্য্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইতেছে তাহা ক্রমে ক্রমে পাঠকদের গোচর করার ইচ্ছা রহিল।

বিশ্বভারতীর কাজ ও জমিয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্স হইতে স্বনামধন্য প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সিলভ্যাঁ লেভি সস্ত্রীক গত কার্ত্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে আশ্রমে আসিয়া পৌছিয়াছেন। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল হাস্যোজ্জল মূর্ত্তি, অমায়িকতা এবং নম্রতা আশ্রমবাসী সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে নিয়মিত বক্তৃতা করা ছাড়াও, বিশ্বভারতীর ছাত্রদের তিনি খুব উৎসাহের সহিত তিব্বতী ও চীন ভাষা শিক্ষা দিতেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বাগচী তাঁহার নিকট চীন ভাষা শিক্ষা করিতে বিশ্বভারতীতে যোগদান করিয়াছেন।

অধ্যাপক লেভির পত্নীও আশ্রমের কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। ফরাসী ভাষার সর্ব্বোচ্চশ্রেণী তিনি নিয়মিত পড়াইতেছেন।

মিষ্টার এল্‌ম্‌হার্ষ্ট নামক একজন ইংরাজ কৃষিতত্ত্ববিৎ আমেরিকায় কৃষিতত্ত্ব-শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বিশ্বভারতীর

কার্য্যে যোগ দিয়াছেন। সুরুলের বাড়ী ও জমিতে তাঁহার তত্ত্বাবধানে বিশ্বভারতীর কৃষি-শিক্ষা-বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের কৃষি ও কৃষিশিক্ষাকেন্দ্র সমূহ তিনি পরিদর্শন করিয়া নানা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

অষ্ট্রীয়াবাসিনী ডাঃ মিস্ ক্র্যামরিশ পি.এইচ্.ডি. আশ্রমে আর্ট-সমালোচক রূপে আগমন করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর চিত্রকলার অধ্যাপকদিগের সহিত তিনি বর্ত্তমানে য়ুরোপীয় চিত্রকলার বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। বিশ্বভারতী-তে তিনি জার্ম্মান ভাষাও শিক্ষা দিতেছেন। আশ্রমের ছোট ছোট বালিকাদের মিউজিক্যাল ড্রিলও তিনি শিক্ষা দিতেছেন।

সম্প্রতি আশ্রমে একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন গুপ্তা কিছু দিন হইতে আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই বিদুষী মহিলাটি এই ছাত্রীনিবাসের বালিকাদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাহা ছাড়া তিনি ইংরাজী অধ্যাপনারও সহায়তা করিতেছেন।

আশ্রমের হিতৈষী মাত্রেই শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন যে আশ্রমের পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত পিয়ার্সন সাহেব দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে গত অগ্রহায়ণ মাসে আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছাত্রদের সহিত মিশিয়া তাহাদের হৃদয় আবার তিনি অধিকার করিয়া লইয়াছেন। বিশ্বভারতীর ইংরাজি ক্লাশে ও বিদ্যালয়ের ইংরাজি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভাগে সর্ব্বদাই তাঁহার সহায়তা পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীযুক্ত এণ্ড্রুজ্ সাহেব দেশের কাজের সহিত এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে সম্প্রতি তাঁহার পক্ষে আশ্রমে একসঙ্গে অধিকদিন বাস করা ঘটিয়া উঠিতেছে না। গত এক বৎসরের উপর ভারতবর্ষের পীড়িত আর্ত্তদের জন্য নানা স্থানে তাঁহাকে যাতায়ত করিতে হইয়াছে। গত আশ্বিন মাসের প্রারম্ভে তিনি পূর্ব্ব আফ্রিকা যাত্রা করিয়াছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিয়াছিলেন যে বিশ্বভারতীর ক্লাশ আবার নিয়মিত পড়াইতে পারিবেন, কিন্তু তাঁহার বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে আরামের অবকাশ রাখেন নাই—তাঁহাকে মোপলাবিদ্রোহের সম্পর্কে মালাবার প্রদেশে যাত্রা করিতে হইয়াছে।

গত চৈত্র মাস হইতে আশ্রমে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান হইয়াছে। বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের প্রসার লাভের সহিত তাহার ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের মধ্যে পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের আবশ্যকতা বোধে "বিশ্বভারতী সম্মিলনী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাতে চিত্রকলা, সমাজনীতি সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা এবং চিত্রপ্রদর্শনী, সঙ্গীত ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই সম্মিলনী হইতে পরিচালিত "বিশ্বভারতী" নামে চিত্রশোভিত এক খানি হস্ত লিখিত পত্রিকা মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে।

"আশ্রম সম্মিলনীর" কাজ ভালই চলিতেছে। নূতন বৎসরে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী সম্পাদক, শ্রীক্ষীরোদ গোপাল সিংহ ও শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত মাসে ইহার বার্ষিক সভায় পূজনীয় গুরুদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্বৎসরের প্রতিবেদন সভায় পঠিত হইয়াছিল। ছাত্রদিগের পরিচালনার সর্ব্বপ্রকার ভার ছাত্রগণের হাতেই সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত আছে। যে সকল নায়ক, অধিনায়ক প্রভৃতি ছাত্র—পরিচালনার জন্য নির্ব্বাচিত হয় তাহারা যাহাতে তাহাদের দায়িত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে এবং প্রত্যেক ছাত্রের দায়িত্ব-বোধ যাহাতে জাগ্রত হয় সে সম্বন্ধে এই সভায় বিশেষভাবে আলোচনা হয়।

ছাত্রগণের হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা গুলি বাহির হইতেছে। গত বৎসর কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সে গুলি এখন চলিতেছে না। সাহিত্য সভাতেও ছাত্রগণ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সুহৃদ নৈশ ও প্রসাদ বিদ্যালয় দুইটি ভালরূপে চলিতেছে। সুহৃদ নৈশ বিদ্যালয়ে এখন চার জন ছাত্র বৈকালে নিয়মিত অধ্যাপনা করিয়া থাকে।

প্রসাদ বিদ্যালয়ের একজন বেতনভোগী শিক্ষক আছেন। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিদ্যালয়টির সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার পুত্র পরলোকগত প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়টি সযত্নে পালন করিতেন, তাঁহারই নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে।

অতিথি সমাগম—আশ্রম পরিদর্শন করিতে অনেক অতিথির সমাগম এখানে হয়; তন্মধ্যে ইয়োরোপীয় পর্য্যটকের সংখ্যা কম নহে। ডাক্তার বে নামক একজন লিথুয়ানীয়ান বিজ্ঞানবিৎ আশ্রমে নিভৃতে বাস করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। তিনি তিন মাস আশ্রমে যাপন করিয়া হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছেন। সম্প্রতি Madam Du Manziarly নামে একজন রুষ দেশীয়া বিদুষী মহিলা আসিয়া ছিলেন। ইনি সংস্কৃতজ্ঞ এবং রুষ ও ফরাসী ভাষায় সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি দুই দিন রুষের বর্ত্তমান অবস্থা ও রুষ সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্রদের সহিত কলাভবনে যে মনোজ্ঞ আলাপ ও আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে অনেক নূতন কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। জার্ম্মানী হইতে প্রত্যাগত আমাদের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীযুক্ত অরবিন্দ মোহন বসু কিছু দিনের জন্য আশ্রমে বাস করিয়াছিলেন। তিনি Electric Theory of matter সম্বন্ধে কয়েক দিন অতি সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছিলেন। গত ৬ই জানুয়ারী তিনি পুনরায় জার্ম্মানি যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডাক্তার শিশির কুমার মৈত্র মহাশয় এক সপ্তাহ আশ্রমে বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, চরিত্রের মাধুর্য্য এবং গম্ভীরতা আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে।

৯ই পৌষ—৯ই পৌষ সকালে প্রচলিত প্রথা মত আম্রকুঞ্জে পরলোকগত আশ্রমবাসীদের স্মরণ করিবার জন্য শ্রাদ্ধসভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সভার পরে প্রাক্তন ছাত্রদের নির্ম্মিত গৃহে আশ্রমিক সংঘের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ নির্ব্বাচিত হন—(ক) আশ্রমিক সঙ্ঘ—সম্পাদক—শ্রীযুক্ত সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার, সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ধনাধ্যক্ষ-শ্রীযুক্ত রথীন্দ্র নাথ ঠাকুর; কার্য্য নির্ব্বাহিকা সমিতির সভ্যগণ, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেন গুপ্ত শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ বসু ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (খ) "শান্তিনিকেতন" পত্রিকা—সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সরোজ রঞ্জন চৌধুরী, সহকারী কার্য্যাধক্ষ শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়, ধনাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পত্রিকা সমিতির সভ্যগণ, শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পাদক, শ্রীযুক্ত তপন মোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুহৃদ কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপোধ্যায়। ৯ই পৌষ বৈকালে প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ হইয়াছিল তাহাতে প্রাক্তনগণ একগোলে জয়লাভ করিয়াছিল।

২৫ ডিসেম্বর ১০ই পৌষ—খৃষ্টোৎসব উপলক্ষ্যে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্ত উইলিয়াম্‌স্ পিয়ার্সান খৃষ্টের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

কলিকাতা সংবাদ

বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া গুরুদেব কলিকাতায় প্রায় তিন সপ্তাহ কাল কাটাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে লইয়া যে সকল সভাসমিতি হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। (১) ১৫ই আগষ্ট, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সম্বর্দ্ধনা এবং তদুপলক্ষ্যে "শিক্ষার মিলন" প্রবন্ধ পাঠ (২) ৮ই আলফ্রেড থিয়েটরে ঐ বিষয়েই মৌখিক বক্তৃতা। আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে এই সভায় আয়োজন করা হইয়াছিল এবং টিকিট বিক্রয়ের টাকা (৬৪০।০) খুলনা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। (৩) ২০ শে, কলকাতা সেবা সমিতির অভ্য-

র্থনা (৪) ২১ শে, সঙ্গীত সঙ্ঘের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে গানের মজলিস। তাহাতে গুরুদেব গান সম্বন্ধে একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন। (৫) ২৯ শে, ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে "সত্যের আহ্বান" প্রবন্ধ পাঠ। (৬) ২রা ও ৩রা সেপ্টেম্বর, জোড়া-সাঁকোতে "বর্ষামঙ্গল" উৎসব। তাহাতে ১৮টি বর্ষাবিষয়ক গান গীত হয় এবং গুরুদেব "কণিকা"র তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেন। গুরুদেব, শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত তেজেশচন্দ্র সেন, বিশ্বভারতীর পূর্ব্ব ও উত্তর বিভাগের সঙ্গীতজ্ঞ ছাত্রছাত্রীগণ এবং আশ্রমের কলিকাতাস্থ সুগায়ক বন্ধুবান্ধবেরা ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে গুরুদেব ষষ্টি-বৎসরে উপনীত হওয়ায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থরাজি গুরুদেবকে সাহিত্য পরিষদ এই উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতীর জন্ম উপহার দিয়াছেন।

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতায় "বিশ্বভারতী-বন্ধু-সভা" নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ বাহিরে প্রচার করা এবং নানা বিষয়ে আশ্রমকে সাহায্য করা ইহার উদ্দেশ্য। "বর্ষামঙ্গল" প্রধা-নতঃ বন্ধুসভার উদ্যোগে সম্পন্ন হয়।

গত ১৭ই ডিসেম্বর ছাত্রসমাজ কর্ত্তৃক আহুত একটি সাধারণ সভায় আমাদের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ মহাশয় "রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বৈদেশিক সংবাদ

এবার পাশ্চাত্য দেশে গুরুদেব কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন সংবাদ পত্রে তাহার বিবরণ সকলেই পড়িয়া-ছেন। এই ব্যক্তিগত সম্মান ব্যতীত নানা পাশ্চাত্য ভাষায় অনূদিত তাঁহার পুস্তকগুলিও সেখানে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেছে এবং তাঁহার নাটকগুলি নানা দেশে অভিনীত হইতেছে। আমরা বৈদেশিক সংবাদ পত্র হইতে সম্প্রতি যে সকল খবর পাইয়াছি তাহা এখানে দিলাম।

গত ৭ই নভেম্বরের বার্লিনস্থ Der Tag পত্রে প্রকাশ :—বার্লিনের ট্রিবিউন থিয়েটারে বৈকালিক অভিনয়ে গুরু-দেবের 'দি গার্ড্নার' এবং 'দি ক্রেশেণ্ট মুন' (শিশু) হইতে কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করা হইয়াছিল।

গত ১৭ই নভেম্বর Doebelner Anzeiger পত্রে প্রকাশ :—জার্ম্মানীর Doebeln সহরে 'দি পোষ্ট অফিস' ('ডাকঘর') এর প্রথম অভিনয় হইয়া গিয়াছে।

গত ২৭শে নভেম্বরের Alpenlandische Zeitung পত্রে প্রকাশ:—অষ্ট্রীয়ার ইনস্‌ব্রুক্ সহরের Stadt Zheatre এ 'দি স্যাক্রিফাইস্' ('বিসর্জ্জন') অভিনীত হইয়াছিল।

গত ২০শে ডিসেম্বরের National Zeitung পত্রে প্রকাশ:—সুইট্‌জারল্যাণ্ডের Basle সহরে প্রতি রবিবার সকালে ধর্ম্ম-বিষয়ক নানা নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ করা হইয়াছিল। 'দি পোষ্ট অফিস্' ('ডাকঘর') নাটকের অভিনয়ের দ্বারা এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়।

Printed by—Jagadananda Ray
at the Santiniketan Press, Santiniketan, Birbhum.

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন।

"শান্তিনিকেতন" পত্রিকার গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট ১ম সংখ্যা নমুনা স্বরূপ ভিঃ পিঃ না করিয়াই পাঠান হইল কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা ভিঃ পিঃ করিয়াই পাঠান হইবে। যদি কাহারো গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে আপত্তি থাকে তো আগামী ৩রা ফাল্গুনের মধ্যেই আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরত আসিলে অনর্থক আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে।

আজ কাল ভিঃ পিঃ খরচ অত্যন্ত বেশি। যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা যদি আগামী ৩রা ফাল্গুনের মধ্যেই পত্রিকার বার্ষিকমূল্য ১॥০ দেড় টাকা মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া দেন তো ভাল হয় নতুবা তাঁহাদের ভিঃ পিঃ খরচ অতিরিক্ত দিতে হইবে।

"শান্তিনিকেতন" পত্রিকা প্রতি মাসের ১৫ই তারিখেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইবে।

নিবেদক

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

কার্য্যাধ্যক্ষ।

শান্তিনিকেতন পোঃ (বীরভূম)

বিজ্ঞাপন

'শান্তিনিকেতন" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারিবন।

ডাকখরচ সহ চিঠি না দিলে কাহারো চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

কার্য্যাধ্যক্ষ

শান্তিনিকেতন পোঃ (বীরভূম)

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ	ফাল্গুন, সন ১৩২৮ সাল।	২য় সংখ্যা

৭ই পৌষে মন্দিরের উপদেশ ও ব্যাখ্যান।

দীক্ষা

যে মহাত্মা এই আশ্রমকে প্রতিষ্ঠিত করেন আজ তাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিক উৎসব। আমরা সকলে জানি যে যৌবনারম্ভে হঠাৎ একদিন সেই দীক্ষার মন্ত্র ছিন্নপত্র সহযোগে বাতাসে তাঁর হাতে এসে পড়ে। সেই মন্ত্র তিনি সকল জীবন ধরে সাধনা করেন। আমাদেরও সকলের জীবন সেই দীক্ষার অপেক্ষা করছে। আমাদের জন্যও তেমনি করেই দীক্ষামন্ত্র বাতাসে ফিরছে। প্রতিদিন প্রভাতের আলোকে সেই মন্ত্র বিকীর্ণ হচ্ছে; কেবল সেটা আমাদের হাতে এসে পড়বার অপেক্ষা আছে। হাতে যে অকস্মাৎ এসে পড়ে তাও ঠিক নয়—ভিতরে আমাদের চিত্ত যখন অনুকূল হয় তখন বাইরে থেকে দীক্ষা কেমন করে' আপনি এসে পৌঁছায়।

অথচ অন্তরের গভীরতার মধ্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আছে—সেই আকাঙ্ক্ষা বারে বারে তাকে তার আবরণ ছিন্ন করতে বল্‌চে, নিজেকে নূতনতর করে প্রকাশ করতে বল্‌চে; কালের যে-সব আবর্জ্জনা মানুষের চারিদিকে জমে উঠে' তার পথকে বাধাগ্রস্ত করে, যে বাধাগুলি অভ্যাসক্রমে সে আপন আশ্রয় বলে কল্পনা করে এসেচে, তাকে ধুলিসাৎ করে' নিজেকে আবার সম্মুখে অগ্রসর করতে বল্‌চে। মানুষের ইতিহাস এই বারে বারে বাধা মোচনের ইতিহাস। বারে বারে তার মনের মধ্যে এই বাণী এসেচে, "ত্যাগ করতে হবে," এই বাণী এসেচে, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—ওঠ, জাগ, আরামের শয্যা ত্যাগ কর, সঞ্চয়ের স্তূপ ধ্বংস কর; সেই পথে চল কবিরা যাকে বলেন, "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ।" অভ্যাসের জড়তায় অন্তরের এই গভীরতম বাণীকে মানুষ অনেক কাল অবজ্ঞা করে,—চলার পথের বাধাকেই ক্রমশ বিপুল করে তোলে। তখনই প্রচণ্ড বিপ্লব ঝড়ের মত এসে পড়ে। যুদ্ধবিগ্রহ হঠাৎ কোথা থেকে অবতীর্ণ হয়ে ঐশ্বর্য্যপ্রাকারবেষ্টিত

জাতির চিত্তকে আঘাত ক'রে,—যে পুরাতন প্রথার আবরণে তার সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে পরম বেদনায় তাকে ছিন্ন করে দেয়, ঘোষণা করে যে কোনো বেষ্টনের মধ্যে তার চিরস্থিতি হতে পারে না। সেই জন্য অপ্রত্যাশিত আঘাতে দেশ সহসা তার দীক্ষার মন্ত্র লাভ করে।

নবজীবনের দীক্ষার মন্ত্র তেমনি করেই শোকের অভিঘাতে অভ্যাসের বাধা বিদীর্ণ করে মহর্ষির চিত্তের মধ্যে এসে প্রবেশ করেছিল। সেই দীক্ষার অমৃতবাণী ভারতের প্রাচীন তপোবনে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। আজ আমাদের কে তাকে গ্রহণ করবে, কখন গ্রহণ করবে, বর্ত্তমান যুগে সেই অপেক্ষা রয়েচে। সেই বাণী নবজীবনের মন্ত্র বহন করচে, কে তাকে নিতে প্রস্তুত আছে? আমরা প্রত্যক্ষ দেখেচি, আধুনিক কালে একজন মহাত্মার চিত্তক্ষেত্রে সেই মন্ত্র বীজরূপে এসে পড়েছিল।

সে মন্ত্রটি কি?

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্। আমরা চোখে যা দেখচি তা কি? এই যে নানা গতিবেগ পরিবর্ত্তনের মধ্যে যা চলছে ঘটছে, এটাই ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু বাহিরের এই গতিকেই মানুষ চরম বলে স্বীকার করে নি। যাঁর দৃষ্টি সত্য হয়েচে তিনি এই চলনশীলতার ভিতর যখন পরিপূর্ণতার আদর্শ দেখেছেন তখন তাঁর চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম সত্য হয়েচে। অন্ধ গতিকে চরম বলে মেনে নিলে জগতে বিরোধের অন্ত থাকে না। মানুষ তা' হলে ঘোর অন্ধতার দ্বারা নীত হয়ে চলে, পরস্পরকে বেদনা দেয়।

কিন্তু শুধু ধ্যানের দৃষ্টিতে সত্যকে দেখা এবং সেই ধ্যানের আনন্দে মুগ্ধ থাকাই জীবনের পূর্ণতা সাধন নয়। দীক্ষার মন্ত্র শুধু ধ্যানের মন্ত্র নয়, তা কর্ম্মের মন্ত্র। সত্যের দীক্ষা নিখিলের সঙ্গে চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মের সত্য যোগসাধন করে—সেই যোগে কল্যাণ। সেই জন্য এই দীক্ষা মন্ত্রের প্রথম অংশে আছে বটে যে বিশ্বজগতে যা কিছু নিরন্তর চলচে তাকে ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত করে উপলব্ধি কর কিন্তু কেবল আন্তরিক উপলব্ধির মধ্যেই মন্ত্রটি থামে নি, তার পরে বলা হয়েচে, যে, যে ভোগের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে সেই আকাঙ্ক্ষাকে কোন্ সত্যের দ্বারা নিয়মিত করবে? "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে—"মা গৃধঃ", লোভ করোনা। লোভের দ্বারা মানুষ ভোগের যে আয়োজন করে তাতেই অনর্থপাত করে; সেই ভোগ নিজের আত্মাকে অবরুদ্ধ ও অন্যের আত্মাকে পীড়িত করতেথাকে---অবশেষে একদিন প্রলয়ের মধ্যে তার অবসান হয়। তার কারণ যে-লোভ স্বার্থের দিকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে তা' সেই বাণীকে অস্বীকার করে যে বাণী জানায় যে, যা কিছু আছে সমস্তকে এক অনন্ত পুরুষের দ্বারা অধিকৃত ব'লে জানবে। লোভ ক্রোধ মোহ আমাদের চিত্তের স্বাভিমুখী গতি, তা' আমাদের স্বার্থের সীমার দিকে টানে, যিনি সকলকে সর্ব্বত্র অধিকার করে আছেন তাঁর দিকের থেকে ফিরিয়ে আনে। এইজন্য পৃথিবীতে লোভকৃত কর্ম্ম স্বার্থঘটিত চেষ্টা কোনো মহৎকে সৃষ্টি করে না—কেন না সৃষ্টি সেই সত্যের দ্বারাই হয় যা নিস্বার্থ আনন্দময়। পূর্ণতার যে প্রেরণা সেই হচ্চে সৃষ্টির প্রেরণা, সেই হচ্চে ত্যাগের প্রেরণা। সেই ত্যাগের দীক্ষাই আমাদের সত্য দীক্ষা, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ।"

মানুষের দৈহিক জীবনের ক্ষুধা তৃষ্ণা বেদনা তাকে ছোট গণ্ডীতে বদ্ধ করে' স্বার্থের দাবীর দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছে, প্রবৃত্তির বেগ তাকে বিচলিত করছে। কিন্তু সে বলে যে এই দাবীকে যদিও অস্বীকার করা কঠিন তবুও একে চরম ব'লে গ্রহণ করা যায় না। আমাদের পেট ভরানো ও সংগ্রহ করার সীমাকে নিরন্তর অতিক্রম করতে থাকলে অবশেষে ক্লান্তি ও অবসাদ আসে, আত্মা মাথা নেড়ে ব'লে, না, এতে হলো না, আমার এতে পরিতৃপ্তি নাই। এমনি করেই এক দিন এক মহাপুরুষের কাছে আকাশের আলোও কালো ব'লে বোধ হয়েছিল। গভীরতম আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ঐশ্বর্য্যের সুখ স্বপ্নে তাড়না করল। কিসের জন্য অন্তরের বেদনা, কি

চাই—তা তখনো মনে আসে নি। আত্মার ক্রন্দন তাঁকে আঘাত করে জাগাল, এমন সময়ে যে দীক্ষার মন্ত্র ভারতের বায়ুতে ভেসে বেড়াচ্ছিল তাই তাঁর কাছে সহসা এসে পৌঁছিল।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

সেদিন থেকে তাঁর যা কিছু ত্যাগ আর নিবেদন সব সেই পরমানন্দ স্বরূপের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তাঁকে অহঙ্কারের বন্ধন বারে বারে ক্ষণে ক্ষণে ছিন্ন করতে হয়েছে। সমগ্র জীবন ধ'রে তিনি অনন্ত জীবনের লক্ষ্যপথে আত্মাকে প্রবৃত্ত করেছেন।

এই তো মানুষের সাধনা। সে যখন ত্যাগের দ্বারা আপন সম্পদকে নিখিলের কাছে উৎসর্গ করে অমনই সে সত্য হয়ে উঠে। এত দুঃখ বেদনার ভিতরও মানুষ তা অনুভব করছে। সে বুঝছে যে কেবলই অন্ধের মত হাতড়াচ্ছে, বিষম ঘূর্ণিপাকে তার অশান্তির শেষ নাই। কিন্তু তার নিজের এবং তার চারিদিকের জড় অভ্যাসে ক্ষুদ্রের পথেই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, ভূমার পথে না। সেই অভ্যাসের অচৈতনতার থেকে তার জাগরণ আর ঘটবে না—সেইজন্য প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের মধ্যে যে উদ্বোধনের দীক্ষা আমাদের কাছে আসচে, যে দীক্ষা আমাদের প্রাচীন ভারতে সত্যদ্রষ্টার কণ্ঠে বাণী লাভ করেচে সে ত বারে বারেই ফিরে যাচ্চে। কিন্তু সেই দীক্ষা সাধকের সার্থক জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে আজ প্রবেশ করুক। এখনই আমাদের শুভক্ষণ আসুক। এখনই আমাদের আত্মার গভীরতম প্রতীক্ষাকে সেই মন্ত্র অমৃতের দীক্ষায় চরিতার্থ করুক।

আনন্দরূপ

শ্লোক পাঠ—ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। ইত্যাদি......

পরিপূর্ণতার আনন্দের থেকেই জগৎ উৎসারিত হচ্ছে। সেই পরিপূর্ণতার আহ্বানেই বিশ্বের এবং সকল ইতিহাসের গতি তদভিমুখে চলচে। এই সত্যের দ্বারা পূর্ণ করে বিশ্বকে দেখতে হবে। তাকে যন্ত্রের মত করে দেখলে হবে না। কোনো কাব্যে তার বাইরের যে রূপ প্রত্যক্ষ হয় তা হচ্ছে ব্যাকরণের নিয়মে, কথার বন্ধনে এবং নানা চেষ্টা ও কষ্টের মধ্যে তার যান্ত্রিক রূপ। কিন্তু কাব্যের আন্তরিক সত্যটি এই ব্যাকরণেই পর্য্যাপ্ত বললে চলবে না। বাইরের থেকে বিশ্লেষণ করে দেখলে কেবল এই ব্যাকরণের নিয়মটাই দেখানো যেতে পারে, কারণ তার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। কিন্তু তার ভিতরকার সত্য কেবল আমাদের নিজের ভিতরকার উপলব্ধির থেকেই দেখা যায় আর কিছুতেই তাকে দেখানো যেতে পারে না। কবিতার আদি ও অন্তে যে আনন্দ আছে তা সেই বলতে পারে যে ব্যক্তি কবিতার আনন্দরূপকে আপন আনন্দের মধ্যেই দেখতে পায়। ব্রহ্মবাদী তেমনি করে বিশ্বের অন্তরের রূপকে দেখেছেন। তিনি আপন আনন্দ হতেই বিশ্বের ভিতরকার সত্যকে দেখতে পেয়েছেন। বিশ্বের যান্ত্রিকতারও একটি দিক আছে। কিন্তু ব্রহ্মবাদীরা বলছেন যে আনন্দের প্রেরণার দ্বারাই যান্ত্রিক জগৎ বিধিবদ্ধ হচ্ছে, সেই প্রেরণাকে যে না দেখছে সে কেবল কষ্টটাকেই নিয়মের জটিলতাকেই দেখছে। মনীষী জ্ঞানের সন্ধানে যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি ভুলে নিরন্তর প্রয়াসে নিযুক্ত থাকেন তখন বাইরের থেকে তাঁর সেই তপস্যা দেখে' তাঁর অজ্ঞ ভৃত্য মনে করে যে তার প্রভু কি বিষম দায়ই বহন করছেন, তাঁর যেন দুঃখের শেষ নাই। সে জানে না যে এই কষ্ট আনন্দেতে লীন। অথচ সে বাইরে থেকে যে প্রকাশ দেখছে তা কেবল মাত্র কষ্ট, চেষ্টা দুঃখকেই সপ্রমাণ করছে। জ্ঞানের সার্থকতাকে যে ব্যক্তি নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া জানে সে নিশ্চিত বিশ্বাসেই জানে যে এই বিচিত্র দুঃখরূপের মূল কথাটি হচ্চে আনন্দ। তাই ব্রহ্মবাদী বলছেন যে বিশ্বের মূল কথা হচ্ছে আনন্দ।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন।" মন্ত্রকে শেষ

বলে জানলেই এবং ঘটনার যোগবিয়োগ অন্ধভাবে হচ্ছে এটা বিশ্বাস করলেই ভয়ের উদ্রেক হয়। যে মানুষ আত্মার মধ্যে সৃষ্টির আনন্দরূপকে দেখছে তার ভয় ঘুচেছে। আত্মার আনন্দেই আমরা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানতে পারি, তাঁকে মনের দ্বারা বাক্যের দ্বারা বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে বুদ্ধি বারবার প্রতিহত হয়ে ফিরে ফিরে আসবে। সব আনন্দেরই প্রকৃতির মধ্যে আছে দুঃসাধ্য সাধন। নিরানন্দ যে সেই ভীরু এবং ভীরু যে সে আনন্দের কর্ত্তব্যকে বহন করতে পারে না, দুঃখকে সে একান্ত দুঃখরূপেই পায়, মৃত্যুকে সে একান্ত মৃত্যুরূপেই জানে। কিন্তু পরম সত্যের আনন্দ যাঁর চিত্তকে অধিকার করে তাঁর কোন ভয় নেই। কোনো ক্ষতিতে তাঁর ক্ষতি নেই কোনো দুঃখে তাঁর পরাভব নেই।

গান

জয় হোক্ জয় হোক্ নব অরুণোদয়
পূর্ব্ব দিগঞ্চল হোক্ জ্যোতির্ম্ময়।
এস অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়।
এস নব জাগ্রত প্রাণ
চির যৌবন জয় গান।
এস মৃত্যুঞ্জয় আশা
জড়ত্ব নাশা
ক্রন্দন দূর হোক বন্ধন হোক ক্ষয়।

নবযুগ

নব অরুণোদয় হয়েছে নবযুগের প্রভাত এসেছে। শান্তিনিকেতনে আমরা সেই নবযুগের অভ্যর্থনার ভার নিয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি অন্ধকার রাত্রি কেটে গেচে। আমরা বিশ্বাস করি যে প্রাচীন কালের বিরোধের যুগ, পরস্পরের বিত্ত অপহরণ করবার যুগ কেটে গেচে। যে বিশ্বাসের মধ্যে নব সৃষ্টির শক্তি আছে তাকে আমরা গ্রহণ করব।

প্রতি বৎসরের উৎসবে এই দিনে সত্যকে আমরা কিছু না কিছু নূতন করে অনুভব করবার ও এইরূপে সমস্ত বৎসরের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করবার চেষ্টা করি। প্রতি বৎসর আমরা কিছু না কিছু লাভ করেছি যা আমাদের ক্ষুধা দূর করেছে। এবৎসর আমাদের শান্তিনিকেতনে নূতন যুগের আবির্ভাব প্রকাশমান হ'ল। এখানে আমাদের নবযুগের অতিথিশালা খুলেছে। 'অপরাজিত বাণী' এসেছে, তাকে আতিথ্যদান করবার জন্য আজকের আয়োজন। এ অনুষ্ঠান কোনো বিশেষ বিষয়ের শিক্ষার জন্য বা কোনো ক্ষুদ্র কর্ত্তব্য সাধনের জন্য নয়। আজ আমরা জয়ধ্বনি জাগাব। নূতন যুগের এই ব্রত নিয়েছি একথা আজ ঘোষণা করতে চাই সেই নবযুগের জন্য আমরা প্রস্তুত হই। যে অবস্থায় প্রাচীনকাল বদ্ধ ছিল সে অবস্থার একসময়ে প্রয়োজন ছিল। যেমন বীজকে প্রথমে ছোট আলে রোপন করা হয়, তারপর অঙ্কুরোদ্গম হ'লে তাকে বৃহৎ ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে হয় তেমনি এক একটি জাতি ছোট সীমানার মধ্যে সত্যসাধনার বীজ বপন করেছিল, কিন্তু কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে তার ভৌগোলিক সীমা অসত্য হয়ে গেছে। জলে স্থলে আকাশে পথ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে। অতীতের বাধা দূর হয়ে গেছে। চিরাভ্যাসক্রমে এই বাধাকে আজও যে স্বীকার করে সে এই বাধাগুলিকে দৃঢ় করে তোলাই আজও তার সাধনা বলে কল্পনা করেচে। জাতীয় বিচ্ছেদের সীমাগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে সে পাকা করে খাড়া করবার চেষ্টা করচে। সমুদ্র পর্ব্বত দিয়ে দেশের যে সব সীমা নির্দিষ্ট ছিল তার ভার মানুষকে তেমন করে বহন করতে হয় নি। কিন্তু আজ কৃত্রিম সীমাবেষ্টনকে জোর করে ধ্রুব রাখবার যে উদ্যোগ নিরন্তর সৈন্য সামন্ত অস্ত্রশস্ত্রের যে আয়োজন তার ভার কৃত্রিমতার ভার, এই জন্য তা দুর্ব্বহ। এই ভার যতই বাড়ে মন ততই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ওঠে সংশয়ের কারণ ততই বাড়তে থাকে—পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস ততই দূর হতে দূরে প্রসারিত হতে থাকে। এমনি করে অস্ত্রের ভারবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের রিপুর ভার এবং রিপুর ভারবৃদ্ধির সঙ্গে তার

অন্যের ভারবৃদ্ধি অন্তহীন আবর্ত্তে ঘুরতে থাকে। এমনি করে কৃত্রিম আত্মরক্ষার চিরবর্দ্ধমান প্রভূত প্রয়াসের চাপে প্রবল জাতিরা আত্মবিনাশের প্রবল উপায় কেবলি উদ্ভাবন করচে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্চে যে, মানুষের সঙ্গে মানুষ যে একত্র হয়েছে এই মহৎ ঘটনাকে আমরা আজও সত্য বলে অনুভব করতে পারচি নে। তাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষায় সেই প্রাচীন অভ্যাসটাকেই মনের মধ্যে পাকা করে তোলবার চেষ্টা এখনো চলচে—তাই স্বাজাত্যের অভিমানকে অতিশয় করে তোলাকেই আমরা কর্ত্তব্য বলে স্থির করেচি। এমন অবস্থায় কোনো একজায়গায় আজ সেই বাণীর ঘোষণার কেন্দ্র থাকা চাই যে বাণী সীমাবদ্ধ অতীত কালের বাণী নয়, যে বাণী ভবিষ্যতের বিরাট মুক্তিক্ষেত্রের বাণী। সেই স্থান থেকে বলতে হবে, নবযুগ এসেচে নব অরুণোদয় হয়েচে। এই বাণী কারা ঘোষণা করবে? ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত যারা তারা নয়; তারা যে প্রবল বন্যায় ডুবতে ডুবতেও তাদের অতীতের সঞ্চয়কে আঁকড়ে থাকে—তারা যে লুব্ধ—বাহিরের ধনকেই একান্ত বলে মানাই যে তাদের চির অভ্যাস। তাই অকিঞ্চনেরই কণ্ঠ থেকে নবযুগের জয়ধ্বনি উঠবে এমন আশা আছে। বিধাতা অক্ষমকে দিয়ে সবলকে পরাভূত করেন। পৃথিবীতে বড় বড় উন্নত মস্তক যাঁদের চরণধূলি গ্রহণ করে, সার্থক, তাঁদের চরণ আশ্রয়হীন পথের ধূলির মধ্যে বিচরণ করেচে।

এমন কথা মাঝে মাঝে শুনতে পাই যে যতক্ষণ রাষ্ট্র-শক্তিতে আমরা শক্তিমান না হই ততক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আমাদের সত্য প্রচারের অধিকার নেই, অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে ধনে মানে সমকক্ষ না হলে তার কাছে আমরা আত্মার বাণী বহন করতে পারব না। কিন্তু পৃথিবীতে সত্যের যাঁরা দৌত্য করেচেন তাঁদের কয়জনই বা বাহ্য সম্মানের পাথেয় নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে যাত্রা করেচেন? দারিদ্র্যও অপমানে কি তাঁদের বাণীর অধিকারকে হরণ ও তার তেজকে খর্ব্ব করেচে? কত কৌপীনধারী ভিক্ষু মানুষের ইতিহাসকে চিরকালের মত অগ্রসর করে দিয়েচেন। বিধাতা কালে কালে দেখিয়েছেন যে যারা ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত তারা মহতী বিনষ্টির দিকে গেছে। মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে আমরা বাহ্য ক্ষমতায় হীন হলেও আত্মার বাণী আমাদেরই কণ্ঠের অপেক্ষা করেছে। নিষ্ঠুর পৃথিবীর সামনে নম্র হয়ে আমরাই বলব দেবতার আহ্বান এসেছে। নব অরুণোদয় হয়েছে। আমরাই পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত থেকে বলব, ঐশ্বর্য্যের মোহ দূর হয়ে যাক্,—আনন্দের সঙ্গে বলব কোনো ভয় নেই। যার বহু সম্পদ আছে সে সম্পদ রক্ষা করতে তাকে সর্ব্বদা ত্রস্ত থাকতে হয়। সে আপনার দ্বাররুদ্ধ রাখে—সেই রুদ্ধতা তার আত্মাকেই সঙ্কীর্ণ করে। তার কাছে পরম সত্য সহজ হয় না; আপনার লোভতৃপ্তির দ্বারাই সে আপনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা বলব, তোমরা লোভকে বিশ্বাস কর, আমরা ত্যাগকে বিশ্বাস করি, তোমরা অস্ত্রশস্ত্রকে বিশ্বাস কর আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি।

এস অপরাজিত বাণী
অসত্য হানি
অপহত শঙ্কা অপগত সংশয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মন্দিরের উপদেশ।

৪ঠা মাঘ ১৩২৮

আমি পূর্ব্বেই বলেচি আমাদের ঋষিদের বলে মন্ত্রদ্রষ্টা। অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে তাঁরা যে সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখেচেন, যা তাঁদের মনন ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেচে তাকেই তাঁরা মন্ত্ররূপে উচ্চারণ করেচেন। এই মন্ত্রগুলিকে মনন করে আমরাও যতক্ষণ মনের মধ্যে তাদের স্পষ্ট করে না উপলব্ধি করব ততক্ষণ আমাদের জীবনে তাঁদের সার্থকতা ঘটবে না। শুধুমাত্র আবৃত্তি করে গেলে কোনই ফল নেই। এই মন্ত্র-

গুলির সুরের সঙ্গে আমাদের জীবনের সুর মিলিয়ে নিতে হবে এই জন্যেই তারা অপেক্ষা করচে। কিন্তু তাদের সেই গভীর সুরটি যদি স্পষ্ট করে না শুন্‌তে পাই তাহলে সুর মেলাব কি করে?

আমরা "পিতানোঽসি" এই যে মন্ত্রটি আমাদের উপাসনায় ব্যবহার করে থাকি, উচ্চারণ করতে করতে এটিকে হৃদয়ের ভিতরে ত দেখ্‌তে হবে। কেননা পিতার সত্যকেই পরম সত্য বলে তাঁরা বিশ্বের মধ্যে এবং চিত্তের মধ্যে নিঃসংশয়ে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন এই জন্যেই তাঁরা এমন জোরের সঙ্গে বলেছিলেন, "আমাদের পিতা, তুমি আছ" চৈতন্যের দ্বার উন্মুক্ত না করে এই কথাটির সমস্ত সত্য আমরা গ্রহণ করতে পারিনে।

এমন কত মন্ত্র আছে যা আমাদের সাধনার আশ্রয়। তার মধ্যে একটি যেমন ;"আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাচ্চেন। যিনি অনন্ত তাঁকে আমরা বাক্যমনের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারিনে, অতএব তিনি অব্যক্ত এমন কথা বলা যেতে পারত কিন্তু যিনি পরম সত্যকে পরম আনন্দরূপে সুস্পষ্ট দেখেচেন তিনি সে কথা বল্‌বেন কি করে? তিনি তাঁর দেখাটিকে হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে রাখ্‌তে পারেন নি, বলে উঠেচেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

কেবলমাত্র অন্তরের ধ্যানের মধ্যেই যে তাঁর উপলব্ধি তা নয়, যা কিছু প্রকাশমান তার মধ্যে তাঁর আনন্দ রয়েচে এইটেই হচ্চে এই মন্ত্রের ভিতরকার কথা। যা কিছু সমস্তের মধ্যেই সেই আনন্দের অমৃতরূপ দেখ্‌তে পেলেই তবেই এই মন্ত্রটিকে আমরা দেখ্‌তে পাব।

জগৎকে কেবলমাত্র বাইরের দিক থেকে ব্যবহারের দিক থেকে দেখি বলেই আশ্চর্য্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ আমাদের ব্যর্থ হয়। আমাদের প্রাত্যহিক অভ্যাস সংস্কার ও প্রয়োজনের ঘন আবরণের মধ্য দিয়ে এর সত্যরূপ দেখাই হয় না। আমাদের অহং-এর সীমার মধ্যে সঙ্কীর্ণ করে যা দেখি তা মরীচিকা মাত্র, তা মৃত্যুর দ্বারা অধিকৃত, তার মধ্যে অমৃতের পরিচয় নেই।

সমস্তকে বর্জ্জন করে দূরে গিয়ে একটা বিশুদ্ধ শূন্যতার মধ্যে আনন্দ পাব, অর্থাৎ অপ্রকাশের মধ্যেই সত্য এ কথা আমরা গ্রহণ করতে পারব না। এই যা কিছু দেখি শুনি স্পর্শ করি, এই সমস্ত ধূলো মাটিতে যাকে তুচ্ছ বলি আর যাকে মূল্যবান করে কল্পনা করি সমস্তই এক অখণ্ড অমৃতের অন্তর্গত।

যা সুখকর তাই আনন্দকর এমন কথা দুর্ব্বলের কথা। সুখের প্রাণ ছোট, সে আঘাতে ক্লিষ্ট হয়, ক্ষয়ে তার ক্ষতি করে, কিন্তু দুঃখসাগরের তরঙ্গেও আনন্দের রুদ্রবীণায় ঝঙ্কার ওঠে। যাঁরা বলেছিলেন "আনন্দরূপমমৃতং" তাঁরা কিছু বাছাই করে নিয়ে বলেননি তাঁরা উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা সংসারক্ষেত্র থেকে সুখের কণা খুঁটে খুঁটে নিয়ে ভিক্ষুকের মত কৃপণের মত ক্ষুদ্র সঞ্চয় নিয়ে কথা কন নি,—তাঁরা সুখদুঃখ সুন্দর অসুন্দর সমস্তকেই বিরাট আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ করে দেখিয়েছিলেন।

আমাদের অন্তরে যে সব রিপু আছে তাদের কাজ হচ্চে জগৎকে খণ্ডিত করে নিয়ে তাতে নিজের রং মাখিয়ে সেই ক্ষুদ্র ফলকটির উপরে নিজের নাম সই করে দেওয়া। আমাদের আমি মনে করে এম্‌নি করেই সে যেন নিজেকে চিরন্তন করে তুল্‌বে। সে নিজের আয়ত্তের বাইরেকার আর সমস্তকেই ছায়াময় করে দিয়ে তাকে অস্বীকার করে। ভূমাকে লুপ্ত করতে চায় নিজেকে বড় করবার জন্যে, কিন্তু একথা যদি আমরা স্পষ্ট করে বুঝতে পারি যে এই আমাদের খণ্ডিত জগৎ সত্য জগৎ নয় এবং সেই জন্যেই আমরা এই মায়ার মধ্যে কেবল মৃত্যুর বঞ্চনাই দেখচি সত্যের অমৃতরূপ দেখচিনে তাহলে আমাদের সাধনা কি পরিমাণে সফল হচ্চে তা প্রতিদিন পরীক্ষা করে জানতে পারি, আমাদের আত্মার সঙ্গে বিশ্বের স্পর্শ ক্রমশ বাধামুক্ত হয়ে অব্যবহিত হয়ে উঠ্‌চে কিনা তা অনুভব করতে পারি।

প্রতিদিন প্রভাতে স্বর্গের মুক্ত উৎস হতে যখন আনন্দের স্রোত আলোকের ধারায় জল স্থল আকাশকে প্লাবিত করে দিচ্চে তখন যদি দেখি আমার চিত্তের দৃষ্টি আবৃত হয়ে রয়েচে

অসাড় রয়েচে আমার মন, ক্ষুব্ধ রয়েচে আমার অন্তঃকরণ তাহলে একথা বুঝবে যে, "আনন্দরূপমমৃতং" এই মন্ত্রের সঙ্গে আমার সুর মিল্‌চেনা।

তখন নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে কেন মিল্‌চেনা? কোথায় লুকিয়ে রয়েচে, লোভ ক্রোধ দুশ্চিন্তা! স্তব্ধ হয়ে বসে ধীরে ধীরে ভিতরকার গ্লানি দূর করে দিতে হবে,—ক্রমে ক্রমে চিত্তের আকাশ যখন নির্ম্মল হবে, অক্ষুব্ধ হবে, তখন সেই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখতে পাব। ক্ষণকালের জন্যেও এই আনন্দের স্পর্শকে হৃদয়ের মধ্যে যদি পাই তাহলে জীবনের সমস্ত বেসুর ক্রমে ক্রমে ঘুচে যেতে থাকবে, এবং আমাদের চিন্তা বাক্য ও চেষ্টা সত্যের সৌন্দর্য্য লাভ করবে।

যিনি আনন্দময় তিনি বিশ্বের অমৃতরূপকে ব্যক্ত করেচেন নিজের পূর্ণতা থেকে; বাইরের তাড়না বা প্রবৃত্তির উত্তেজনা থেকে নয়,—বিশ্বের সত্যরূপ যখন দেখি তখন এই সত্যটি আমরা জান্‌তে পারি এবং তখন এই সত্যের দ্বারাই আমাদের নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর হয়। আমাদের জীবন আমাদের সৃষ্টির ক্ষেত্র। এই সৃষ্টিতেই আমাদের আত্মার প্রকাশ। সেই প্রকাশ যদি অমৃতরূপের প্রকাশ হয় তা হলে সত্য প্রকাশ হয়। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের জীবনের সৃষ্টি অমৃতরূপের সৃষ্টি—এই সৃষ্টির দ্বারা তাঁরা মানবাত্মার চির সত্যকে প্রকাশ করেন। তাঁদের জীবনের কর্ম্ম অন্তরের পূর্ণতা থেকে উৎসারিত—স্বার্থের তাড়না রিপুর উত্তেজনা থেকে নয়। তাঁদের চিত্তের মধ্যে আনন্দ তাঁদের কর্ম্মের মধ্যে অমৃত। বিশ্বসৃষ্টির যে সত্য, তাঁদের জীবনের সৃষ্টিরও সেই সত্য। তাঁদের জীবনে এই মন্ত্রটি উজ্জ্বল হয়ে আছে আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

১৩২৭—১৩২৮ সালের প্রতিবেদন।

গত বৎসরের সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয় গত ৮ই পৌষের বার্ষিক সভায় আশ্রমের যে প্রতিবেদন পাঠ করেন আমরা তাহা হইতে কয়েকটি বিষয় সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বর্ত্তমানে বৃত্তিভোগী অধ্যাপকের সংখ্যা ২১ জন, তন্মধ্যে ৩ জন বিশেষ ভাবে বিশ্বভারতীর অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

আলোচ্য বৎসরের শেষ তারিখে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ১৬৫ জন তন্মধ্যে ৩২ জন, অধ্যাপকদের পরিবারভুক্ত আত্মীয়। এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোন্ দেশ হইতে কতজন আসিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। সিন্ধু—৫, আসাম (শ্রীহট্ট)—১১, কাথিয়ার—১, বম্মা—২, ছোটনাগপুর—৩, যুক্তপ্রদেশ—৪, নেপাল—২, খাসিয়া—১, গুজরাট—১১, জয়পুর—২, কচ্ছ—৫, বঙ্গদেশ—৯৩, সিংহল—৪।

বর্ত্তমান বর্ষে আশ্রমের পাকশালা হইতে মোট ৪, ৬৬৬ জন অতিথি বিনাব্যয়ে একবেলা আহার করিয়াছেন অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ছয় জন করিয়া অতিথি ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার এককালীন এবং মাসিক নিয়মিত দানের উপরেও এ বৎসর আরও সতর হাজার আট শত উনপঞ্চাশ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

আশ্রমের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বান্ধবদের নিকট হইতে এ বৎসর চব্বিশ হাজার টাকা দান সাহায্য আমরা পাইয়াছি।

পুস্তকাগারের পুস্তকসংখ্যা গতপূর্ব্ব বৎসরে ১০,০০০ ছিল, এ বৎসর তাহা বাড়িয়া ১১,৬৩০ হইয়াছে। ফ্রান্স হইতে ছয় বাক্স পুস্তক আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত রাণা ফরাসী হইতে তাঁহার পরলোকগত পুত্রের বহুমূল্যবান্ পুস্তকসমূহ এবং ফ্রান্সের ম্যাজেগিমে তাহাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী আশ্রমকে উপহার দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরি তাহাদের প্রকাশিত

গ্রন্থরাজি দান করিয়াছেন। ভারতীয় ইতিহাস ও প্রাচ্য-বিদ্যা সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় পুস্তকাবলীর সংগ্রহ চলিতেছে।

এ বৎসর ছাত্রগণ ফুটবলে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। তাহারা কুচবিহার, বর্দ্ধমান, কাঞ্চনতলা, গুসকরা, এবং কলিকাতার অগিল্‌ভি হোষ্টেল, অক্স্‌ফোর্ড মিশন হোষ্টেল ও বেঙ্গলটেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌-এই কয়েকটি জায়গার খেলোয়াড়দের সহিত ফুটবল ম্যাচে সকলের নিকটই জয়ী হইয়াছে।

আশ্রমের হাঁসপাতালে আটজন রোগীর শয়নের ব্যবস্থা আছে, ইহা যথেষ্ট নয় সুতরাং হাঁসপাতালকে বৃহৎতর করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

সুরুলের ১৯ বিঘা ধানের জমিতে এবার ৫৪ মণ ধান ও ৭ কাহন খড় উৎপন্ন হইয়াছে। তরিতরকারী, খেজুর গুড়, চীনাবাদাম আথ প্রভৃতিও কিছু কিছু পাওয়া যায়। সুরুলের গোশালা হইতে মোট ৬৬৮।০ আনার দুধ পাওয়া গিয়াছে। আশ্রমের ১৫ বিঘা জমি হইতে মোট ৪১ মণ অর্থাৎ ১৪৩।০ আনার ধান এবং সবজিবাগানে ৭৪৮৫ পাইয়ের ফসল পাওয়া গিয়াছে। নেবুবাগানের গাছগুলি গত বৎসরের ভীষণ রৌদ্রদাহে অধিকাংশ মরিয়া গিয়াছে।

আশ্রম-সংবাদ

সাতই পৌষের বাৎসরিক উৎসবের পর জনকোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পদ্মাবক্ষে কিছুকাল কাটাইবার নিমিত্ত গুরুদেব গত ১৩ই পৌষ শিলাইদা গিয়াছিলেন। সপ্তাহকাল কাটাইয়া গত ২২শে পৌষ সেথান হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি নূতন নাট্য লিখিতে এতদিন প্রবৃত্ত ছিলেন। সেটি সমাপ্ত হইলে ৩০শে পৌষ আশ্রমবাসীদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। সংশোধন ও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় দুইবার পাঠ করিয়াছিলেন। তিন দিনের জন্য কলিকাতা গমন করিয়া বন্ধুদিগের নিকট নাট্যটি দুইদিন পড়িয়াছিলেন।

অতিথি-সমাগম।—গত ৭ই মাঘ শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর কন্যা এবং সহোদরা শ্রীমতী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় আশ্রমে আসিয়াছিলেন। শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী ভিজিয়ানাগামের মহারাণীর সংগৃহীত প্রায় একশত প্রাচীন মোগল, কাঙ্‌রা ও রাজপুত চিত্র সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে আকবরের আমলের ইন্দো-পারসীয়ান মিশ্রণ চিত্রও দু-একটি ছিল। ছবিগুলি প্রাচীন হইলেও পূর্ব্বকালের ওস্তাদ শিল্পীদের নকল চিত্রই ইহার মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল। দুখানি মোগল বাদসাহের আকৃতি-চিত্র এবং দু তিন খানি কাঙ্‌রা (বা কাশ্মিরী) ও একটি রাজপুত চিত্র নিপুণ শিল্পীর কলমে আঁকা বলিয়া মনে হয়। মোগল আমলের প্রাচীন চিত্র গুলি ছাত্রদের বিশেষভাবে দেখিবার ও জানিবার সুবিধার জন্য কলাভবনের চিত্রশালায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। আশ্রমের সকলেই এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২৯শে পৌষ হল্যাণ্ড হইতে মিসেস্ ভ্যান্ ঈগেন নামে একজন বর্ষীয়সী মহিলা কিছুদিন আশ্রমে বাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। হল্যাণ্ডে বাস কালে গুরুদেব পুত্র, পুত্রবধূ ও মিঃ পিয়ার্সনের সহিত এই মহিলার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিসেস ভ্যান ঈগেনের সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা আছে। তিনি বাংলা গান শিখিতেছেন, এবং বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রীকে নিয়মিতরূপে য়ুরোপীয় সঙ্গীত ও স্বরলিপি শিক্ষা দিতেছেন। ইঁহার মধুর চরিত্র এবং মাতৃহৃদয় আমাদের সকলকে মুগ্ধ করিয়াছে।

মান্দ্রাসের "লীগ অব টিচরস্ এ্যাণ্ড পেরেণ্টস্"এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কুলকারনি গত ২২ ও ২৩শে পৌষ আশ্রমে ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিক্ষানীতি ও শিশুদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

কলিকাতার বিখ্যাত নাহার পরিবারের শ্রীযুক্ত পৃথ্বিসিং নাহার কয়েকদিনের জন্য আশ্রমে আসিয়াছিলেন। বিশ্ব-

বিশ্বভারতীতে জৈনধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনার যে ব্যবস্থা হইতেছে সে সম্বন্ধে তিনি নানাভাবে আমাদের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

গত ১৬ই মাঘ পিঠাপুরামের মহারাজবাহাদুর সপরিবারে আশ্রমে আগমন করিয়া তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার বীণকরও আসিয়াছেন। তিনি দুই তিন দিন সন্ধ্যায় বীণা বাজাইয়া সকলকে আনন্দিত করেন। বীণকর উপস্থিত আশ্রমে থাকিয়া বীণাবাদন শিক্ষা দিতেছেন।

পুস্তকালয়।—পূজার ছুটির মধ্য হইতে এবার আশ্রমে গৃহ নির্ম্মাণ ও সংস্কার কার্য্য বিশেষ তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে দিন দিন নানা দেশীয় বহুমূল্য পুস্তক আসিতেছে কিন্তু স্থানাভাব বশতঃ ভাল করিয়া বন্দোবস্ত করা যাইতেছে না। সেইজন্য লাইব্রেরি গৃহের উপরকার দোতলা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে—এবং তাহার পাশে নূতন বড় পুস্তকাগার নির্ম্মিত হইতেছে। লাইব্রেরিটি সম্পূর্ণ হইতে এখনও কিছুদিন সময় লাগিবে।

ছাত্র সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। সত্য, মোহিত ও শমীন্দ্র কুটীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে দুইটি দ্বিতল গৃহের পত্তন করা হইয়াছিল তাহার একটি সম্পূর্ণ হইয়াছে অন্যটিও শেষ হইতে বিশেষ বিলম্ব নাই। নূতন দ্বিতলটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হইয়াছে।

যান—বোলপুর সহরে ও ষ্টেশনে গমনাগমনের জন্য একটি মোটরলরি আনা হইয়াছে। তাহাতে মাল ও যাত্রী দুই বাহিত হয়।

৭ই পৌষের উৎসবের পর নূতন বৎসরের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও সাতদিনের ভ্রমণের ছুটি ছিল। পাঁচজন অধ্যাপকের সহিত ৫টি দল নানা দিকে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। আশ্রমের অদূরবর্ত্তী কোপাই নদীর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিতে কয়েকজন ছাত্র ও প্রাক্তনছাত্র-অধ্যাপক বাহির হইয়াছিলেন। পদব্রজে তাঁহারা সাঁওতাল পরগণার উপসীমায় উপস্থিত হইয়া কোপাই নদীর উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন। অন্য একদল বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে গিয়াছিলেন। আর একটি দল দেওঘর, ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে ও অন্য দুটি দল সাহেবগঞ্জ, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন। একটি দল মুঙ্গেরে রেলের ধর্ম্মঘটের জন্য আট্‌কাইয়া গিয়া জলপথে মুঙ্গের হইতে গোয়ালন্দ দিয়া ঘুরিয়া আসেন। ইঁহাদের ভ্রমণ সব হইতে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

আশ্রম হইতে ২২মাইল দূরে কবিবর জয়দেবের জন্মভূমি কেন্দুলি তীর্থে প্রতিবৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় ৪।৫ দিন ধরিয়া মেলা হয়। সেখানে নানা স্থান হইতে বাউল, সন্ন্যাসী দরবেশ প্রভৃতি আসিয়া থাকেন। মেলাতেও ২৫।৩০ হাজার লোক হয়। আমাদের আশ্রম হইতে কয়েকজন অধ্যাপক ও ছাত্র গমন করিয়া চারদিন মেলাস্থানে তাঁবুতে বাস করিয়াছিলেন। যাহাতে অজয় নদীর উপরের দিকের জল দূষিত না হয় তাহার জন্য আমাদের দল বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছয়টি বৃহৎ পুষ্করিণীতে ঔষধ দিয়া জল শুদ্ধ করা হইয়াছিল। খাবারের দোকানের জলেও ঔষধ দেওয়া হইয়াছিল। দোকানে জলখাবার খাইয়া লোকেরা যে সকল পাতা রাস্তা ও দোকানের আশে পাশে ফেলিয়া দেয় তাহা অচিরে পচিয়া স্বাস্থ্যহানিকর হইয়া উঠে। সেগুলি আমাদের কলাবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ছাত্রদের লইয়া ঝুড়ি করিয়া সরাইয়া ফেলিতেন। মেলাতে জল বিতরণের চেষ্টা সফল হয় নাই। রোজ সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা ও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে ছায়াচিত্র দেখাইয়া শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনায়ক মাসেজী প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেন লোকে খুব উৎসাহের সহিত শুনিত। ইহা ব্যতীত স্বাস্থ্যবিষয়ক নানা চিত্র মেলায় স্থানে স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখা হইয়াছিল। অধ্যাপক লেভি, তদীয় পত্নী ও ডাক্তার ক্র্যাম্‌রিশ বাউল ও বৈষ্ণবদের গান সাধনভজন দেখিবার জন্য প্রায় ত্রিশমাইল পথ গরুর গাড়ীতে কেন্দুলি গিয়া এক রাত্রি কাটাইয়া আসিয়াছেন। মেলা দেখিয়া এবং

বাউলদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া আচার্য্য লেভি বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভক্তি এবং সৌজন্যের গুণে আশপাশের সাধারণ লোকদের সহিত অতি সহজে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

সভা—আশ্রমসম্মিলনীর পূর্ণিমা ও অমাবস্যা অধিবেশনগুলি নিয়মিত ভাবে হইতেছে। গত পূর্ণিমা সম্মিলনীতে শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশী তাঁহাদের কোপাই অভিযানের মনোজ্ঞ বিবরণ পাঠ করিয়া সকলকে আনন্দদান করিয়াছিলেন।

অমাবস্যা সম্মিলনীতে কাজের কথা হয়। অধিনায়কগণের মন্তব্য, প্রতিনিধিগণের প্রতিবেদন ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। এবারকার সভার বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল ছাত্রদিগের বিচার সভার পুনর্গঠন।

৬ই মাঘ মহর্ষিদেবের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধদিনে সকালে মন্দিরে আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন।—আগামী সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইবে।

দ্বিপ্রহরে মাধবীকুঞ্জে স্বর্গীয় মহর্ষিদেবের স্মরণ সভা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ বসু তাঁহার সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহর্ষিদেবের জীবনের মূলগত তত্ত্বটি ব্যক্ত করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ও শ্রীমান্ বামন ভাণ্ডারে স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গ্রন্থ এবং জীবনস্মৃতি হইতে কোন কোন অংশ পাঠ করেন।

গত ১০ই মাঘ সন্ধ্যায় সাহিত্য সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ছাত্রগণ নিজেদের রচিত গল্প, ভ্রমণ কাহিনী কবিতা ইত্যাদি পাঠ করিয়াছিল। বালকগণ ছোট দুটি হেঁয়ালী নাট্য অভিনয় করিয়াছিল। নূতন বৎসরে শ্রীমান্ পরেশনাথ বিশী সাহিত্য সভার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ফরাসী হাস্যরসিক নাট্যকার মোলিয়্যারের ত্রৈশতাব্দীক উৎসবে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। গুরুদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর ফরাসী ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পেস্‌টনজি হিরজি ভাই মরিস্ মহোদয় অমর সাহিত্যিক মোলিয়্যারের জীবনী ও লেখার সহিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরিচয় সাধন করিয়াছেন। অতঃপর অধ্যাপক লেভি মূল ফরাসী ভাষায় মোলিয়্যারের একটি সনেট ও একটি ব্যঙ্গ নাট্যের একটি দৃশ্য পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার আবৃত্তি বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সব শেষে গুরুদেব হাস্যরস-প্রধান নাট্য ও লেখার সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন।

গত ১০ই মাঘ শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় কবীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অধ্যাপক লেভি ওরিয়েণ্টল কনফারেন্স এর সভাপতি রূপে আহুত হইয়া কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি ঢাকা গমন করিবেন।

ডাঃ ষ্টেলা ক্রামরিশ শিল্পকলা সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মিশর, এসেরিয়া, গ্রীস্, ও ইটালীয় শিল্পকলার বিষয় পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে। ক্রমে তিনি মধ্যএসিয়া, চীন জাপান ও ভারতবর্ষের শিল্পকলা সম্বন্ধে বলিবেন।

বিশ্বভারতীর নূতন সংস্থিতি অনুসারে পরিষৎ সংগঠিত হইতেছে। সংসৎ, কর্ম্ম সমিতি, শিক্ষাসমিতি প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য কর্ম্মকারকগণের নাম দেওয়া হইল ;—

ধনরক্ষক—শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ম্মসচিব—শ্রীজগদানন্দ রায়

অধ্যক্ষ উত্তরবিভাগ—শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী

অধ্যক্ষ পূর্ব্ববিভাগ—শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

কর্ম্মসমিতি—অধিষ্ঠাতা আচার্য্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়, অধ্যক্ষদ্বয়, শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ও শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। নির্ণীত শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ কর, সি, এফ, এ্যাণ্ড্রুস্। মনোনীত শ্রীযুক্ত

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরগোপাল ঘোষ, অনিলকুমার মিত্র, এবং ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাঘমাসে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর দুইটী অধিবেশন হইয়াছে। একটিতে বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীমান্ সৈয়দ্ মুজতবালি "শিশুমারী" বিষয়ে একটি রচনা পাঠ করেন। দ্বিতীয়টিতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় "ক্ষুদ্রের খেলা" নাম দিয়া শব্দতত্ত্ব বিষয়ক একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। "ক্ষুদ্র" শব্দের উৎপত্তি এবং নানা ভাষায় তাহার রূপান্তর কেমন করিয়া হইল তাহা অতি সুন্দররূপে তিনি বুঝাইয়া-দেন। গুরুদেব সভাপতি ছিলেন।

গত ডিসেম্বর মাসে আশ্রমের দুইটি প্রাক্তনছাত্র শ্রীশ্যামকান্ত সর্দ্দেসাই ও শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় উচ্চ শিক্ষা-লাভের জন্য জর্ম্মণী গমন করিয়াছেন। শ্রীশ্যামকান্ত উচ্চ বিজ্ঞান বিশেষত রসায়ন শাস্ত্র ও জ্যোতিষচন্দ্র চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবেন সংকল্প করিয়া গিয়াছেন। গত সপ্তাহে বার্লিন হইতে তাঁহাদের চিঠিতে পৌছনসংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দেশ বিদেশের সংবাদ।

(১)

গত ১৪ ই মাঘে আশ্রমের হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত সেবক বোমানজি য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বোম্বাই সহরে "পার্শি রাজকীয় সভায়" বক্তৃতাকালে বলেন:—

মধ্য য়ুরোপের প্রদেশগুলি—এমন কি ফ্রান্স, ইতালি, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি মিত্র রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা পরম আগ্রহের সহিত কেন পর্য্যালোচনা করিতেছে তাহার কারণ আমি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে আমাদের কবি রবীন্দ্র নাথ ঐ সকল প্রদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানি, অষ্ট্রিয়া, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতেরা আমাদের এই বরেণ্য কবিকে যখন তাঁহাদের হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন তখনকার সেই মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। পাঁচ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর নিদারুণ মর্ম্মবেদনায় পীড়িত হইয়া যে প্রেম এবং শান্তি লাভ করিবার জন্য য়ুরোপের মানবাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহারই একটি পূত মূর্ত্তবিগ্রহরূপ কবির মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বন্দনা করিয়াছিলেন। এমন কি সুইডেনের রাজাও কবিকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার এই পরম সুযোগ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গভীর বাণী এবং বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে মধ্য-য়ুরোপের সুধীবর্গ অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং মহাত্মা গান্ধী দ্বারা প্রবর্ত্তিত স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতের এই নব আন্দোলন তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহৃদয়তার সহিত পর্য্যালোচনা করিতেছেন।

(২)

আয়র্লাণ্ডের নবীন কবি Padraic Colum—যাঁহাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজবিদ্রোহী বলিয়া আয়র্লাণ্ড হইতে আমেরিকায় পলাইতে হইয়াছিল—তিনি ১৭ই ডিসেম্বর Nation ও Athenaeum সাপ্তাহিক পত্রে য়ুরোপ হইতে যে সকল মনীষী ব্যক্তিরা গত বৎসর আমেরিকায় বেড়াইতে বা বক্তৃতা দিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয় আলোচনাচ্ছলে লিখিতেছেন:—

আমেরিকার খবরের কাগজ যে উদ্দেশ্যকে (Cause কে) সুনজরে না দেখে তাহার বিষয় যদি কোন য়ুরোপের বক্তা বক্তৃতা দেন তবে আমেরিকার জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের আমেরিকায় পূর্ব্ব পর্য্যটনের বিজয় গৌরবস্মৃতি এবারকার পুনরাগমনের উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার এক মাত্র কারণ এই যে তিনি—প্রকাশ্য সভায় না হউক—কথাবার্ত্তায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের সপক্ষে মত দিয়াছিলেন।

ইহা শুনিয়া ইংরাজেরা হয়ত মনে করিবেন যে আমেরিকার মত বন্ধু তাঁহাদের আর কেহ নাই। কিন্তু ইহা সত্য

নহে। রবীন্দ্রনাথ যদি মুরদের স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেন তাহা হইলেও আমেরিকাবাসীর হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিতেন না। যাহা আছে তাহা বর্জ্জন করিয়া নূতনের আমদানি করা আমেরিকানের ধাতে সহিবে না। তাহারা নিজে এক সময়ে বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং সেই সময়কার বীরত্বের কীর্ত্তিকাহিনী লইয়া আজিও তাহারা গৌরব অনুভব করিয়া থাকে ; কিন্তু অন্য দেশের রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বন্ধন মোচনের চেষ্টাকে ইহারা কখনই সুনজরে দেখিতে চাহে না।

(৩)

হাঙ্গারী হইতে জনৈক ভদ্রলোক পাঞ্জাবে তাঁর বন্ধুকে যে পত্র দিয়াছেন তাহার কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

আমি আশা করি যে প্রাচী সমস্ত পৃথিবীতে একটি নব-চেতনার স্পন্দনে তরঙ্গিত করিবে। টলষ্টয় কেবলমাত্র আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার দোষ দেখাইয়া ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমাদের নবযুগের মহাপুরুষ, তিনিই আমাদের সম্মুখে নব সভ্যতার আলোক উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। Jesus এর পূর্ব্বে John the Baptest এর ন্যায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে টলষ্টয় আমাদিগকে নব জীবনের পথে অগ্রসর করিয়াছেন ইহা আমি স্বীকার করি।

এই দুই মহাপুরুষের রচিত "What is art" নামক দুইটি রচনায় ইঁহাদের মতের পার্থক্য ধরা পড়িয়াছে। টলষ্টয় কোনটা art নয় তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সমস্ত art এর মর্ম্মগত সত্যটি তাঁহার দিব্য দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। "Personality" পুস্তকখানি তোমার নিকট হইতে পাইয়া তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। রবীন্দ্রনাথ ভারতের প্রাচীন ব্রহ্ম-জ্ঞানের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছেন ; তিনিই আমাদিগকে মোহান্ধকার হইতে সত্যের জ্যোতির্ম্ময় লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারিবেন। আমি এখানে তাঁহার শিক্ষাপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছি। যদি তাঁহার নিকট যাইতে পারিতাম তবে কি আনন্দ হইত! একই কালে একজন মহাপুরুষের সঙ্গে বাস করিয়াও তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইতে বঞ্চিত হওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে!

(৪)

গুরুদেব গতবার যখন লণ্ডনে ছিলেন, তখন Millais house এর বিখ্যাত ফটোগ্রাফার Hoppe তাঁহার যে ফটো তুলিয়াছিলেন তাহার প্রশংসা এখন পর্য্যন্তও শোনা যায়। এই ছবি সম্প্রতি লণ্ডনের এক প্রদর্শনীতে দেওয়া হইয়াছিল। তাহার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া Daily Graphic লিখিতেছে:—

চিক্কণ রজত-শুভ্র শ্মশ্রু এই যে রবীন্দ্রনাথ, ইনি এখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনকার শতসহস্র নরনারীর হৃদয়ে তাঁহার পূজার দীপ প্রদীপ্ত রহিয়াছে। তিনি হৃদয়ের রাজা, তাঁহার গতি তাঁহার প্রতি পদক্ষেপ রাজোচিত।

চৈত্র, ১৩২৮

শান্তিনিকেতন

সম্পাদক
শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

তৃতীয় বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য
ডাক মাশুল সহ ১৷৷০ টাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

আমি মোলিয়ারের বিষয়ে একরকম অনভিজ্ঞ, তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান, তা দাদার বাংলা অনুবাদ ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে হয়েচে ; আর বোধ হয় মোলিয়্যারের ইংরাজী অনুবাদও কিছু কিছু পড়েচি। সাহিত্যের কোনো ভাল রচনা ভাষান্তরিত হলে তা বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, সেই অনুবাদে সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয় না, এ বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। অনুবাদের ভিতরে দিয়ে লেখকের সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না এবং সে পরিচয়কে অবলম্বন করে সমালোচনা করাও কঠিন। আমাদের ফরাসী ভাষার অধ্যাপক মরিস সাহেব স্বয়ং মাদাম লেভির কাছে মূল মোলিয়ার পড়চেন সুতরাং এ বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর বক্তৃতায় আমরা নাট্যকার সম্বন্ধে অনেক পরিচয় লাভ করেচি। আজ আমি সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলব।

মরিস সাহেবের বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বলেচেন যে মোলিয়্যার সম্বন্ধে এরূপ দোষারোপ কেউ কেউ করেন যে, তিনি যে সকল পাত্রের চরিত্র চিত্রিত করেচেন, অতিশয়োক্তির দ্বারা, স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করে তাদের দেখানো হয়েচে। এই উক্তির প্রতিবাদ বা সমর্থন করা আমার সাধ্য নয় কিন্তু এই বাদানুবাদ সম্বন্ধে আমি মোটামুটি কিছু বলতে পারি।

শিল্পী একটা বিশেষ প্ল্যানকে নির্ব্বাচন করে তাঁর কাজ করেন। তিনি যা গড়ে তুলবেন তার সমগ্রতার রূপ তাঁর মনে আছে, তাকে জাগিয়ে তোলবার জন্য তিনি বহির্জ্জগতের থেকে সব জিনিষকে অবিকল গ্রহণ করে একত্র সংগ্রহ করেন না। তিনি কতক ত্যাগ করেন, কতক গ্রহণ করেন—তাদের নিয়ে এমন সংলগ্ন সঙ্গত একটা চিত্র সৃষ্টি করেন, যা তাঁর মনের পরিকল্পনার অনুরূপ। বাইরে যা দেখচি তার প্রতিলিপি তৈরী করলে তা যথার্থ আর্ট বলে গণ্য হয় না। সেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডি 'ম্যাকবেথ্' বা 'হ্যামলেট্' এর বর্ণিত ঘটনা বাইরের বিশ্বে কখনো এত বেশি সুসংলগ্ন ও নিবিড়ভাবে ঘটে না। শোক দুঃখ, চিত্তের আবেগ, চিত্তদাহ, এমন উজ্জ্বলভাবে তিনি চিত্রিত করেচেন যে বাস্তব জগতে তা এমন করে প্রকাশ পায় না। কারণ প্রকৃতিতে ছেদ আছে—শোকদুঃখ অমন সংহতভাবে দেখা দেয় না। সংসারে চলতে ফিরতে, নানাপ্রকার আলাপআলোচনা, ছোটবড় নানাবিধ কাজকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেই শোকদুঃখ বিস্তৃত হয়ে যায় বলে তাঁর তীব্রতা চোখে পড়ে না। কিন্তু কবি তাদের এমন সুব্যক্ত সুদৃঢ় করে তাঁর ট্র্যাজেডি লেখেন যে সমস্ত উপাদান আমাদের সামনে নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘনীভূত হ'য়ে দেখা দেয়। রাজা লীয়ার ঝড়ের মধ্যে গিয়ে বিদূষকের সঙ্গে যে রকমভাবে বাক্যালাপ করলেন, পাগলেও তেমন করে না। এই যে এখানে বাস্তবজগতের হিসাবে অতিশয়তা প্রকাশ হয়েচে, এটা কাব্যজগতের পক্ষে অতিশয় হয় নি। অতএব কাব্যে কোন্ অতিশয়োক্তি সত্য ও কোন্‌টা অসত্য তার একটা আদর্শ আমাদের মনে থাকা চাই। একটা বাহিক প্রাসঙ্গিক ও আকস্মিক ব্যাপারকে যদি বেশি প্রাধান্য দান করা হয় তবে সাহিত্যে তা সয় না। যেমন একজন পাত্রের খুঁড়িয়ে হাঁটা যদি রঙ্গমঞ্চে দেখানো যায় তবে তাতে লোককে হাসানো যেতে পারে কিন্তু এতে কোনো নিত্য সত্যকে প্রকাশ করা হয় না। এরকম বাড়াবাড়কে trick বা কৌশল বলা যেতে পারে কিন্তু তাতে কোনো পাত্রের চরিত্রের কোনো সত্য উপাদান দেখানো হয় না।

শিশু মনে এমন করে ভাবে, বিশ্বকে এমন করে দেখে যে তার মধ্যে আমরা অসঙ্গতি দেখতে পাই, আমাদের হাসি পায়। এই অদ্ভুত অসংলগ্নতাই শিশুস্বভাবের চিরন্তন লক্ষণ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু পরিমাণে এই শিশু আছে—আমাদের সমস্ত চিন্তা সমস্ত আচরণই যুক্তিসঙ্গত নয়। এই অসঙ্গতি এই অযৌক্তিকতা যেখানে মানবচরিত্রের কোনো একটি ব্যাপক পরিচয় দেয় সেইখানেই সে হাস্যরসের বড় রকমের উপাদাম যোগায়। আর যেখানে সে নিতান্ত অগভীর, যেখানে সে মানবচরিত্রের

একটা অসাময়িক বিষয় মাত্র, সেখানে সেটাতে কেবল ভাঁড়ামি প্রকাশ করা যায়।

মোলিয়ারের বিষয়ে আমার যতটুকু জ্ঞান আছে তাতে একথাই বলতে পারি যে তিনি যে খ্যাতি লাভ করেচেন শুধু ভাঁড়ামি করলে সেই পরিমাণ খ্যাতি পাওয়া যায় না। কোনো পাত্রের তোৎলামিতে লোকে হেসে অস্থির হতে পারে কিন্তু তাতে যথার্থ সাহিত্যরসনৈপুণ্যের যশ লাভ করা যায় না। প্রতি পাত্রের গভীর প্রকৃতিতে এমন একটা হাসি বা কান্নার দিক আছে যাকে স্থায়ী প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করলে সে ম্লান হয় না। যা আকস্মিক তাকে অত্যুক্তির দ্বারা উৎকটভাবে প্রকাশ করলে যে ক্ষণিকভাবে আপাত ফল ফলে না তা নয়—এতে লোককে হাসানো আর কাঁদানো যেতে পারে। তার দৃষ্টান্ত, আমাদের দেশে বক্তৃতাতে 'মা' শব্দ বারংবার ব্যবহার করলে শ্রোতার চোখে জল আনা খুবই সহজ কেননা বাঙালী সন্তান হচ্চে মায়ের আদরে সন্তান; এবং নাটকে নভেলে সতীত্বের অত্যুক্তিপূর্ণ চিত্র আঁকলেও পাঠকের মনকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়া যায়, কেননা বাঙালী স্বামীর প্রধান গৌরব হচ্চে স্ত্রীর কাছে পূজা আদায় করে'। এই মনের অভ্যাসের অনুবর্ত্তনে লোককে উত্তেজিত করা খুব সহজ ব্যাপার কিন্তু সেটা নিত্য সাহিত্যের যোগ্য বিষয় নয়। স্থানিক সাময়িক কোনো বিশেষ হৃদয়গত অভ্যাসকে আঘাত করে' যে একটা সস্তাবকমের হৃদয়াবেগ উৎপন্ন করা যায় কোনো বড় প্রতিভাশালী লেখক সেই সব খেলো জিনিষ নিয়ে কখনো সাহিত্যসৃষ্টি করেন না।

মোলিয়ারের "লা বুর্জোয়া জাঁতিয়ম" নামক নাটকের অনুবাদ "হঠাৎ নবাব" টাই ধরা যাক্। অকস্মাৎ কেউ অনেক টাকা পেলে তার কেমন মনের বিকার হয় এটাই এর মূল কথা নয়। কিন্তু এতে দেখানো হয়েচে যে একজন 'হঠাৎ নবাব' ধনীব্যক্তির চালচলন লক্ষ্য করে' তার অনুকরণের যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করে সেটা কি জিনিষ। সেই অনুকরণের চেষ্টা মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ ব্যাপার—সে একজন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ বিকৃতি নয়। তাই এই অনুকরণ প্রায়ই অসঙ্গত আকার ধারণ করে, তাই মানুষের পক্ষে এ একটা চিরকেলে হাস্যরসের বিষয়। সকল দেশেই সকল কালেই এই হাস্যরসের উপাদান মানুষের মধ্যে পাওয়া যায়,—অন্তরের মধ্যে যে জিনিষটাকে পাওয়া যায় নি, বাইরের উপকরণ দিয়ে সেইটেকে কৃত্রিমভাবে খাড়া করে' লোককে ভোলাবার অপরিমিত প্রয়াস আমরা নানা জায়গায় নানা প্রকারেই দেখে থাকি—আর তাই নিয়ে হাসাহাসি চলে।

"হঠাৎ নবাব" নাটকটাকে এই হিসাবে অত্যুক্তিপূর্ণ বলা যেতে পারে, যে তাতে অল্প পরিসরে অনেকখানি হাসির উপাদান ঘনীভূত করে' দেখানো হয়েচে। পূর্ব্বেই বলেচি বাস্তব সংসারে এই সকল হাস্যকর ব্যাপার বিরল বিকীর্ণ হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়। মোলিয়ার তাকেই বেছে নিয়ে নিবিড় করে' সাজিয়ে তুলেছেন। এই সাজিয়ে গড়ে তোলাতেই শিল্পীর বাহাদুরী। করুণ রসকে ব্যক্ত করতে হলেও শিল্পীকে এমনি ঘনীভূত চিত্র আঁকতে হয়। এই দুই ক্ষেত্রে বিচার করে দেখা দরকার যে যা আকস্মিক, যা উপরে উপরে ভাসচে, তাকে অবলম্বন করা হয়েচে, না, স্বভাবের গভীরতর লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করা হয়েচে।

রুশের বর্ত্তমান অবস্থা।

গত পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনে মাদাম স্থ মজিয়ানি নামক একটি রুশীয় মহিলা আসিয়াছিলেন, মাঘ সংখ্যায় তাঁহার সংবাদ দিয়াছি। তিনি রুশীয় হইলেও গত কয়েক বৎসর হইতে ফ্রান্সেই অবস্থান করিতেছেন। গত ২রা জানুয়ারী কলাভবনে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

ভৌগোলিক অবস্থানে ও মানস প্রকৃতিতে রুশ পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনসেতু স্বরূপ, এবং বিশ্বমানবতার অভিব্যক্তিতে রুশেরও একটি বিশেষ স্থান আছে। রুশের লোকেদের মধ্যে চিত্তের যে অসামঞ্জস্য দেখা যায় তাহার কারণ এই যে

রুশচিত্তে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তার একত্র সমাবেশ হইয়াছে। রুশীয়রা যেমন বহির্জগতে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে, তেমনি অন্তরের গভীর লোকেও প্রবেশ করিতে জানে। সে জীবনের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও যেন তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন।

মস্কো সহরটি রুশের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। মস্কোবাসীদের এই প্রদেশটুকুর জন্য একটি বিশেষ মমতা আছে। এখানকার শিক্ষাদীক্ষা গণতন্ত্রমূলক। এখানকার ব্যবসায়িশ্রেণীই দেশহিতব্রতে অগ্রণী, তাহারা ধনী হইলেও সাহিত্যে ও শিল্পে অনুরাগী এবং তজ্জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিয়া থাকে। এখানে বলশেভিকদের আধিপত্য নাই। শিক্ষার জন্য রুশীয়দের খুব আগ্রহ, সকল শ্রেনীর ছাত্রছাত্রী দলে দলে এই সহরে থাকিয়া পড়াশুনা করে এবং বিদ্যালাভের জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে।

রুশীয়েরা রঙ্গমঞ্চের বিশেষ পক্ষপাতী। ভাল নাটকের অভিনয় দেখিতে রুশীয় যুবকদের অসামান্য আগ্রহ আছে। নাট্যকলা ও শিল্পকলার মধ্য দিয়া সকল শ্রেণীর লোক তাহাদের মনের ক্ষুধা মিটাইয়া থাকে। রুশনাট্য অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ।

রুশীয়দের চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব যে, তাহারা সকল কর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ এবং তাহাদের প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস আছে। এবিষয়ে ভারতবাসীদের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই। এই সাদৃশ্যের কারণ কি? ভারতবর্ষ ও রুশ উভয় প্রদেশেই দিগন্তপ্রসারিত সমতল প্রান্তর আছে। ভারতবর্ষের রৌদ্রদাহ প্রখর, রুশের সূর্য্য উত্তাপহীন। দারুণ উষ্ণতা ও শৈত্যের জন্য উভয় দেশবাসীকেই বৃক্ষমূলে অথবা গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে হয়। এইরূপে দিন যাপন করা ধ্যান ধারণার পক্ষে অনুকূল। ইতালী ও ফ্রান্সের লোকেরা বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে সুতরাং তাহাদের মনঃস্থির করিবার অবসর হয় না। রুশীয়েরা দৈবশক্তিতে বিশ্বাস করে এবং সকল দেশের সাধুসন্ন্যাসীদের ভক্তি করে। তাহারাও তীর্থযাত্রায় বাহির হয় এবং এদেশের মত মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া দেবতাকে প্রণাম করে। সেখানেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রথা বর্ত্তমান। রুশের ধর্ম্মমত খুব উদার, রুশ ইতিহাসে ধর্ম্মের জন্য কখনো যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই। রুশে তাতার, মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান, সকল ধর্ম্মাবলম্বীই স্বাধীনভাবে বাস করিতেছে। রুশীয়দের মহাকাব্য হইতে প্রাচীন কালে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। ৮

রুশীয় আধিভৌতিক জগতের সহিত আপন চিত্তের যোগ স্থাপিত করিতে শেখে নাই। সে বস্তুবিশ্ব সম্বন্ধে উদাসীন। এই মায়াময় জগৎ হইতে মুক্তিলাভ করা তাহার ধর্ম্মের লক্ষ্য। তাহার মনে কোনো ভাবই সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সে ক্রমাগতই তাহার মত ও বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করে।

টলষ্টয়ের জীবন ব্যাকুলতায় পূর্ণ ছিল। তিনি ধনী হইলেও সংসার হইতে দূরে নির্জ্জনবাসের ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু স্ত্রীর জন্য তাহা পারেন নাই। তাঁহার শেষ জীবনের রোজনাম্‌চাতে মানবাত্মার অতি করুণ ও বিষাদপূর্ণ কাহিনী বিবৃত আছে। তিনি ভগবানের জন্য ব্যাকুল ছিলেন কিন্তু কোন্ পথে চলিলে শান্তি মিলিবে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। জীবনের সঙ্গে তিনি কোনোরকম বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারেন নাই।

রুশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু বলা কঠিন কারণ আমি বহুদিন হইতে ফ্রান্সে আছি। দারিদ্র্যের পীড়ন ও অরাজকতা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য যে সকল রুশীয় ফ্রান্সে পলাইয়া আসে তাহাদের নিকট হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। সেখান হইতে কোনো পুস্তক বা সংবাদপত্র আমাদের হাতে আসিবার উপায় নাই কারণ যাহা পাওয়া যায় তাহা কেবল বলশেভিকদের কাগজ পত্র। বন্ধুদের চিঠিও সেন্সরের হাত দিয়া আসে বলিয়া আমরা ঠিক খবর পাই না। পেট্রোগ্রাডের সংস্কৃতাধ্যাপক, আমার জনৈক বন্ধু, আমাকে লিখিয়াছেন, 'আমি দেশের এই দুর্দ্দিনে এখান হইতে নড়িব না। রুশদেশ পলাতকদের চায় না, যাহারা এখানেই বাঁচিয়া বর্ত্তিয়া থাকিতে পারিবে তাহারাই দেশকে নূতনভাবে গড়িয়া তুলিবে।' এইরূপে

সেখানে দৃঢ় সংকল্প ও নবযুগের আশার বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া একদল লোক জীবন যাপন করিতেছে। রুশের জনসাধারণ তাহাদের দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও কোনো আধ্যাত্মিক নেতার আবির্ভাবের জন্য পথ চাহিয়া আছে। রাজনৈতিকদের আশ্বাসবাণীতে তাহাদের বড় বেশী আস্থা নাই।

রুশে এখন কাগজের টাকার প্রচলন, কিন্তু তাহার মূল্য অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। ৮০,০০০ রুব্‌লে একটি নেপকিন্ (ছোট গামছা,) পাওয়া যায়। আমার পরিচিত এক ব্যক্তি কয়েকটি পুরাতন পোষাক বিক্রয় করিয়া নয় লক্ষ রুবল সংগ্রহ করিয়াছিল! সেই অর্থে সে ঘুষ দিয়া রুশ হইতে গোপনে পলাইয়া আসিয়াছে। ধনী অপেক্ষা চাষী প্রজারাই বলশেভিকবাদের ঘোর বিরোধী। বাস্তব বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহারা এই সকল হাঙ্গামায় যাইতে নারাজ। মস্কোতে এখন দোকানে কেনাবেচা হয় না, যতটুকু হয় তাহা গোপনে, কর্ত্তৃপক্ষের অগোচরে। আপনি যদি দাঁত তোলাইতে চান বা বই কিনিতে চান তো আট ঘণ্টা পরিশ্রম করুন, তবেই তাহার বিনিময়ে উক্ত কোনো একটি ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবেন। রুশীয়েরা টাকা উঠাইয়া দিতে চাহে, কিন্তু দেখা যাইতেছে তাহা একেবারেই অসম্ভব।)

মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে'
যেদিন হাওয়া উঠ্‌ত ক্ষেপে'
ফাগুন বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগ্‌ত পুলক কি মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হ'ত কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে;

তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে'-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল ক্ষেতে
সূর্য্য-ওঠার রাঙা-রঙীন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠ্‌ত দুলে'
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়
সেদিন আমার হ'ত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবী ;
তাইত হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবী !

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে'
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে জননীর কোলের পরে
জন্মেছিলি মর্ত্ত্যঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হ'তে তোরে
কে এনেচে হরণ করে',
ঘিরে তোরে রাখে নানান্ পাকে!
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাইত ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
"গেছিস্ দূরে, অনেক দূরে,"
কি যেন তাই চোখের পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভাল করে' পাইনি তাহা বুঝে ;
ফিরেছি তাই নানামতে
নানান হাটে, নানান্ পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার আঙন মাঝে
প্রভাত রবির শঙ্খ বাজে,
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্তমনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
হেথা হ'তে গেলেম দূরে
কোথা যে ইঁট-কাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্ব্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই ত মেশা,

আবর্ত্তনা জমে উপার্জ্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরাণ কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলক-ধাঁদায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে,
পথ বেড়ে' যায় ঘুরে' ঘুরে',
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে' যাই মুক্তি সুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে' দিই টুটে',
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েচেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হ'তে না রইল ব্যবধান।
যে দূতগুলি গগন পারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েচে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কি ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা' নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে
চারদিকে এই যে-ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন॥*

২৩শে ফাল্গুন
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভারতবর্ষের প্রভাব।

(আচার্য্য সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয়ের "বিশ্বভারতী"তে ১৭ই নভেম্বর ১৯২১, তারিখে প্রদত্ত প্রথম বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।)

আজকের দিনে এদেশের অনেকে যে কথা বলে থাকেন, ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখলে মনে হয় সে কথা যেন সত্য—তার চার দিক অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সমুদ্রের বেড়া দিয়ে ঘেরা, যেন সে সব থেকে বিচ্ছিন্ন, কারও কাছে কিছু প্রায় নি, নিজেই নিজের সভ্যতা একলা গড়ে তুলেছে। কিন্তু এর চেয়ে ভুল ধারণা আর নেই। পুরাতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে চতুর্দ্দিকের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যে যোগ হয়েছিল, পৃথিবীর আর কোনও দেশের সঙ্গে তা হয় নি।

আরবদেশের উত্তরে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকার ভূখণ্ডে এসিরিয়ার কাছে ইউফ্রেটিস নদীর ধারে 'মিতানি' নামে একটি প্রবল রাজ্য ছিল—এখানে ১৫০০খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের একটি প্রাচীন লিপি পাওয়া গেছে—এটি হিটাইট ও মিতানি রাজ্যের একটি সন্ধিপত্র; সন্ধির অন্যান্য কথার মধ্যে দুই রাজার একজনের পুত্রের সহিত অন্য রাজার কন্যার বিবাহের কথা আছে। এই সন্ধিলিপির শেষে যে সব ব্যাবিলোনীয়ন দেবদেবীর দীর্ঘ তালিকা আছে তার মধ্যে আমাদের আর্য্য

* এই কবিতা বিশ্বভারতীর কৃষিবিভাগের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'চাষা' নামক হস্তলিখিত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

দেবতা মিত্র বরুণ ইন্দ্র প্রভৃতির নাম, আমরা বেদে যে পর্য্যায়ে পেয়ে থাকি, সেই পর্য্যায়ে উল্লেখ আছে। মিত্র বরুণ এখানেও বহু-বচনে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লিখিত ["না-সত্য-অন্-ন" (Na-Sa-at-ia--an-na দেবতা হয় ত অশ্বিনী কুমার দ্বয়।)]

মিতানি-রাজ্যের কতকগুলি রাজা ও নদীর নাম প্রাচীন এসিরিয় কিউনিফরম অক্ষরে পাওয়া গেছে সংস্কৃত এবং ইরানিয়ন ভাষার সঙ্গে তার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে।

নদী—Naharain (নারায়ণ ?)

রাজাদের নাম artatama
Shutarna
Sa-us-Sa-tar
Du-Sh-ratta
Saush-Shatar (Kshatra ?)

খুব প্রাচীন কালে হিতাইতরা প্রবল পরাক্রান্ত জাতি ছিল, প্রধাণত এদের সংঘর্ষে এসেই ঈজিপ্ট সাম্রাজ্য খণ্ড হয়ে যায়। এব্রাহিম এঁদের কাছে জমি নিয়েছিলেন প্রাচীন হিব্রুলেখায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিছু দিন থেকে এদের সম্বন্ধে যে পর্য্যালোচনা হচ্ছে, তাতে কোনকোনও ইয়োরোপীয় পণ্ডিত অনুমান করেছেন এরা আর্য্য জাতি। এখানকার ইষ্টক লিপিতে আর্য্য ভাষার কিছু কিছু অংশ যে পাওয়া গেছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই—কিন্তু তথাপি হিতাইতরা যে ইণ্ডো-ইয়োরোপিয়ান এমন কথা অধ্যাপক মহাশয় মনে করেন না।

Cunieform দুরকমের—কতকগুলি ভাবের ব্যঞ্জনার দ্বারা কথাকে প্রকাশ করা হয়েছে, অন্যগুলো শাব্দিক। খৃষ্টের জন্মের দুহাজার বছর কিম্বা তারও পূর্ব্বে ব্যাবিলোনিয়নদের নিকট থেকে হিতাইতরা কিউনিফরম শিক্ষা করেছিল। এ থেকে তারা চিত্রিত চিহ্নের সাহায্যে মনের মধ্যে এক একটা ধ্বনি-কে জাগিয়ে ছোট ছোট চিত্র-শব্দাংশ জুড়ে জুড়ে লেখার একটা প্রণালী উদ্ভাবন করেছিল। এসিয়া মাইনরে ইতিহাস উদ্ধারের জন্য খনিত খাদের মধ্যে লিখিত ইষ্টক-লিপিতে যে সব অভিধানের সাহায্যে হিতাইতরা কিউনিফরমে অক্ষর লিখতে ও নানা [illegible] করতে শিখত, তার ভগ্নাংশ কিছু কিছু পাওয়া গেছে। একজন অষ্ট্রীয়ান পণ্ডিত Hrozny, হিতাইতদের কিউনিফরম লেখার পাঠোদ্ধার সম্প্রতি করতে পেরেছেন। এ সম্বন্ধে এখন অনেক আলোচনা চলছে—এ আলোচনা সম্পূর্ণ হলে খুব বড় একটা কিছু আমরা পাব, আশা করা যেতে পারে।

আশ্রম-সংবাদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অপূর্ব্বানন্দ রায় চার বৎসর আশ্রমে বাস করিয়া ষোল বৎসর বয়সে গত ৭ই ফাল্গুন রবিবার টাইফয়েড রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। আশ্রমের নানা অনুষ্ঠানের সহিত সে যুক্ত ছিল—এবৎসর সে আশ্রমসম্মিলনীর ছাত্রপ্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। এই তরুণ বয়সে তাহার এ আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই বিশেষ ব্যথিত হইয়াছি।

হলাণ্ডের মিসেস ভ্যান ঈগেন মাসাধিক কাল আশ্রমে বাস করিয়া গত ২০শে ফাল্গুন স্বদেশ যাত্রা করিয়াছেন। বিদায়ের পূর্ব্বে একদিন তাঁহার গৃহে বন্ধুবান্ধবদের সান্ধ্য সম্মিলনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতবিভাগের যে সকল ছাত্র ছাত্রীরা তাঁহার কাছে যে কয়েকটি ইয়োরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছেন এই সভায় তাহা তাঁহার সহিত গান করিয়া শোনান। পূজনীয় গুরুদেব "মাধবী হঠাৎ কোথা হতে এল ফাগুন দিনের স্রোতে" গানটি গাহিয়াছিলেন। বীণকর মহাশয়ের বীণার ঝঙ্কারে সে দিন সন্ধ্যা ভরিয়া উঠিয়াছিল। ইহার তিন দিন পরে প্রাঙ্গণে আর একটি সঙ্গীত-সভা হয়। বীণকর মহাশয় সেদিন বেহালা বাজাইয়াছিলেন, ছেলেদের ও মেয়েদের কয়েকটি গানের পর মিসেস ভ্যান

ঈগেন 'ডাচ' ভাষায় গান করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, "আমি যে গানটি গাহিলাম তাহা সমুদ্রের গান। হল্যাণ্ড সমুদ্র বেষ্টিত—সমুদ্রের অসীমতা ভগবানের আরাধনা মনের মধ্যে জাগাইয়া তোলে। এখানকার এই উদার বিস্তীর্ণ প্রান্তরেও সমুদ্রের সেই ভাবটি আছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ, অজস্র আলোক মানুষকে ভগবানের সান্নিধ্যে লইয়া যায়। আপনাদের প্রীতি এবং আতিথ্য আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। আশ্রমের সকল কাজ জয়যুক্ত হউক এই কামনা করিয়া আমি আপনাদের সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছি।"

দীর্ঘকাল আশ্রম হইতে দূরে থাকিয়া গত ৬ই ফাল্গুন এণ্ড্রুজ সাহেব আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। গত ৮ই ফাল্গুন তিনি মালাবার দেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আশ্রম-বাসী সকলের নিকট বিবৃত করেন। তার পর দিনই, ই, আই, রেলওয়ে ধর্ম্মঘট মীমাংসা করিবার জন্য তাঁহাকে এলাহাবাদে যাইতে হইয়াছে।

সুরুলের কৃষি বিদ্যালয়। ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতে শ্রীযুক্ত এল্ কে এলম্হার্ষ্ট মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে সুরুলে কৃষি বিদ্যালয়ের কাজ নিয়মিত ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ এলম্হার্ষ্ট তাঁহার স্বাভাবিক উৎসাহ এবং উদ্যম ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছেন। সুরুলে যাইবার পূর্ব্বে এলম্হার্ষ্ট সাহেব কৃষি ছাত্রদিগকে সিউড়ি এবং হেতম-পুরের কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী দেখাইতে লইয়া গিয়াছিলেন। ছাত্রেরা তন্নতন্ন করিয়া সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছে, নানা বিশেষজ্ঞের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার সুযোগও তাহারা এই সূত্রে পাইয়াছিল। আশেপাশের গ্রামের অবস্থাও তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া আসিয়াছেন। এখন নিকটবর্ত্তী সুরুল প্রভৃতি গ্রামকে আশ্রয় করিয়া সকলের সহিত মিলিয়া কৃষি ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ চিন্তা করিতেছেন। শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় সুরুলের কাজে যোগ দিয়াছেন। তিনি সুরুল গ্রামের অনাদৃত বিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছেন এবং ইতিমধ্যে আশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছেন।

গত ৯ই ফাল্গুন মিঃ এলমহার্ষ্ট "ভূমিলক্ষ্মীর বিত্ত অপহরণ" সম্বন্ধে একটি অতি উপাদেয় বক্তৃতা করেন।—মানুষ ভূমির বিত্ত লইয়া নিজের দেহ পরিপুষ্ট করিতেছে, তাহার আরাম বল, বিলাস বল, সবই এই ভূমির ঐশ্বর্য্য হইতে। কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য অসীম নহে; ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মূলধনের উপর কেবলই চেক কাটিতে থাকিলে এমন দিন আসেই যখন ঐশ্বর্য্যের বেশী কিছু আর অবশিষ্ট থাকে না। প্লাবনের জলের পলি মৃত্তিকা দিয়া বছরের পর বছর প্রকৃতিদেবী নিজে যে সকল স্থলে এই হরণ পূরণের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন সে সকল স্থল ছাড়া অন্য সর্ব্বত্রই ৫০০ বৎসরের মধ্যে মানুষ কৃষিসম্পদকে নষ্ট করিয়া নিজে নষ্ট হইয়াছে—বক্তা নানা ঐতিহাসিক প্রমাণ্য ঘটনা হইতে তাহা প্রতিপন্ন করেন। এই তথ্যটিকে স্বীকার করিয়া ভূমির হৃত সম্পদকে ফিরাইয়া দিবার কোনো প্রণালী উদ্ভাবন না করিতে পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই। বারান্তরে এই বক্তৃতা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা হইবে।

বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীগৌরগোপাল ঘোষ বি, এস সি মহাশয় মিঃ এলমহার্ষ্টকে কৃষি বিদ্যালয়ের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সুরুলে গিয়া বাস করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও ছাত্রদিগকে উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়মিত পড়াইতেছেন।

কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত শিলাইদা হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া সুরুলে আছেন। যতীনবাবু গত এক বৎসর গ্রামসংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ছাত্রদিগের সাহিত্য সভার নিয়মিত অধিবেশন হইতেছে। এই মাসে শান্তি, বাগান ও প্রভাত পত্রিকা গুলির জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক পত্রিকার পরিচালকগণ মনোরম করিয়া সাজাইয়া, হেঁয়ালী নাট্য অভিনয় করিয়া, সরবৎ ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া সকলকে যথাসাধ্য আনন্দ দিতে

চেষ্টা করিয়াছেন। পিয়ার্সন সাহেবের উৎসাহে দ্বিতীয় বর্গের ছাত্রগণ একটি ছোট ইংরেজি নাট্য অভিনয় করিয়াছিল।

গুরুদেবের সন্ধ্যার ক্লাশ প্রায় নিয়মিত হইতেছে। বলাকা পাঠ শেষ হইলে লোকসাহিত্যের "ছেলেভুলানো ছড়া" পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

যদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়া একটা তুলনা মূলক আলোচনা করা যায় তাহা হইলে তাহা যে বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষনীয় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কাজটি কেহ গ্রহণ করিলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মূলগত সামঞ্জস্য অনেকটা ধরা যাইবে।

গুরুদেব সম্প্রতি 'গোরা' পড়িতেছেন। এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও হইতেছে। গোরা পাঠ সমাপ্ত হইলে আলোচনার সারাংশ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

গুরুদেব ইংরাজী সাহিত্যের ক্লাশে বিশ্বভারতীর ছাত্র দিগকে নিয়মিতভাবে আধুনিক কবিদিগের কবিতা পড়াইতেছেন এবং ছোট ছেলেদিগকে মুখে মুখে শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন।

অধ্যাপক লেভি ঢাকা, পাটনা সারনাথ, কাশী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিব্বতী ও চীন ভাষার ক্লাশ পুনরায় খুব উদ্যমের সহিত চলিতেছে।

সম্প্রতি চেকোশ্লাভেকিয়ার অন্তর্গত বোহিমিয়া প্রদেশের প্রাগ্ সহর হইতে মিষ্টার মারোশ্লাফ্ হেফ্ কোফ্স্কি নামে একজন শিল্পী আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের ও অধিবাসীদের চিত্র আঁকিবার জন্য এ দেশে কিছুকাল অবস্থান করিবেন। ছবির রং ফলানো সম্বন্ধে তিনি বহু বৎসর সাধনার পর কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে প্রচলিত রং দিবার প্রণালী ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক। তাঁহার বর্ণ বিন্যাস প্রণালী অনুসারে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথের একটি ছায়াচিত্রের প্রতিলিপি তিনি অঙ্কিত করিতেছেন।

জার্ম্মাণির পত্র

গুরুদেব গত বৎসর গ্রীষ্মকালে বার্লিনে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে Mr. Rathenau এবং তাঁহার ভগ্নী Mrs. Andreaeর সঙ্গে গুরুদেবের আলাপ হয়েছিল। Mr. Rathenau এখন জর্ম্মাণির Foreign Minister। ভ্রাতা এবং ভগ্নী উভয়ের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পাণ্ডিত্যে গুরুদেব খুব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। Mrs. Andreae কিছুদিন পূর্ব্বে গুরুদেবকে যে চিঠি লিখেছিলেন তার সারমর্ম্ম দেওয়া গেল :—

যখন বিগত বৎসরের দিকে ফিরে তাকিয়ে লাভ ক্ষতির হিসাব করি; যখন ভাবি কি করব—আমার এই ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে কেমন করে আমার দেশের অন্ধ, ব্যথিত নরনারীকে বোঝাব যে এই যে সুখ দুঃখ এরই আনন্দবেদনার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়েই আমরা প্রকৃতপক্ষে মানুষ হয়ে উঠতে পারি—তখন আমার অন্তরাত্মা এই বর্ত্তমান বৎসরের সেই পরম শুভমুহূর্ত্তের দিকে ফিরে চায় যখন আপনি আমাদের গৃহে এসেছিলেন। সে স্মৃতি আমার মনে চিরজাগ্রত হয়ে আছে। এই স্তব্ধ রহস্য-গভীর রাত্রিকালে আমি সেই অপূর্ব্ব বসন্তরজনীর স্বপ্ন দেখ্‌ছি। আপনি তখন আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন এবং আমাদের সরল ভক্তিনম্র হৃদয় আপনার পায়ের কাছে নত হয়ে পড়েছিল। এখন বর্ষ শেষ হয়ে এলো; এই পীড়িত দেশে নব বৎসর যখন আমাদের দ্বারে অনেক দাবী বহন করে এলো তখন আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের অন্তর থেকে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌চে—"হে গুরু, তোমার শান্তি, করুণা নিয়ে এসো; দাও আমাদের তোমার সেই সত্য ও ভূমার প্রতি অটল নির্ভর। তোমার মত আমাদেরও হৃদয় প্রেমে সরস হউক, তোমার অমর আশার বাণী আমাদের শোনাও। অক্ষয় ও চিরন্তন সত্যের বার্ত্তা বহন করে তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়াও। বস্তু-জগতের মায়া-বেষ্টন থেকে মুক্তিলাভ করে আমাদের আত্মা ভূমার আনন্দলোকে বিচরণ করুক। আমরা সকলেই New Testamentএ পড়েছি 'ভগবান যাকে ভালবাসেন তাকেই আঘাত করেন'—এ সত্য আমরা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বুঝি না। এই দুঃখের ভিতর দিয়ে চির-সার্থকতা, আত্ম-উপলব্ধির ভিতর দিয়ে চরম-পরিপূর্ণতা আমরা কেমন করে লাভ করতে পারি সেই শিক্ষা আমরা তোমার কাছ থেকে চাই। আমরা সমস্ত বিরোধের মধ্যে কেমন করে ঐক্যকে লাভ করব তা' তুমি আমাদের বলে দাও। আমাদের ঘরে ঘরে প্রলয় অগ্নি জ্বলে উঠেচে; এই ধ্বংশের মধ্যে, এই রুদ্রালোকে নিত্যসত্যের মঙ্গল প্রকাশকে কেমন করে দেখ্‌তে হবে বলে দাও। তোমাকে আমরা চাই; সমস্ত ব্যথিত চিত্তের বেদনায় তোমার হৃদয় কাঁদে, সেই হৃদয়ের স্পর্শ আমরা লাভ করতে চাই।"

শান্তিনিকেতন পত্রিকার নিয়মাবলী।

১। "শান্তিনিকেতন" পত্রিকার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ১৸৹ দেড় টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য দুই আনা। মাঘ মাস হইতে পর বৎসরের পৌষ পর্য্যন্ত "শান্তিনিকেতনের" বৎসর গণনা করা হয়। যিনি যে মাসে গ্রাহক হইবেন তাঁহাকে সেই বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই পত্রিকা দেওয়া হইবে।

২। প্রতি বাংলা মাসের ১৫ই তারিখে "শান্তিনিকেতন" প্রকাশিত হয়। কোনও গ্রাহক সময় মত কোন সংখ্যা না পাইলে ডাকঘরে অনুসন্ধান করিয়া সেই মাসের মধ্যেই আমাদিগকে জানাইবেন নতুবা অপ্রাপ্ত সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী থাকিব না।

৩। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। নহিলে হারানো পত্রিকার জন্য আমরা দায়ী হইব না।

৪। বিজ্ঞাপন দাতাগণ প্রতি মাসের ২রা তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপন না পাঠাইলে সেই মাসে তাঁহাদের বিজ্ঞাপন ছাপা হইবে না। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন বা বন্ধ করিতে হইলেও উক্ত তারিখের মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৫। বিজ্ঞাপন দাতাগণের পক্ষে মূল্য অগ্রিম দেয়। এক বৎসরের মূল্য অগ্রিম দিলে টাকায় এক আনা কমিশন দেওয়া হয়।

৬। বিজ্ঞাপন দাতাগণের প্রেরিত ব্লক হঠাৎ ভাঙিয়া গেলে আমরা দায়ী হইব না।

বিজ্ঞাপনের হার।

ক।	সাধারণ	১পৃষ্ঠা	মাসিক		৬৲
	"	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"		৩।৹
	"	সিকি পৃষ্ঠা	"		২৲
	"	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"		১।৹
খ।	কভারের	২য় ও ৩য় পৃষ্ঠার	১পৃষ্ঠা	মাসিক	৭৷৷৹
	"	" "	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	৪৲
	"	" "	সিকি পৃষ্ঠা	"	২৷৷৹
	"	" "	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"	১৷৷৹
গ।	কভারের	চতুর্থ বা শেষ পৃষ্ঠার	১পৃষ্ঠা	মাসিক	৯৲
	"	" "	অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	"	৪৸৹
	"	" "	সিকি পৃষ্ঠা	"	২৸৹
	"	" "	অষ্টমাংশ পৃষ্ঠা	"	১৸৹

৭। নিম্নলিখিত ঠিকানায় অর্থাদি ও চিঠিপত্র পাঠাইতে হইবে।

৮। ডাকমাশুল সহ চিঠি না দিলে কাহারো চিঠির জবাব দেওয়া হয় না।

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী
কার্য্যাধ্যক্ষ।
শান্তিনিকেতন পোঃ
(বীরভূম)

বৈশাখ, ১৩২৯

শান্তিনিকেতন

সম্পাদক
শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

তৃতীয় বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য
ডাক মাশুল সহ ১।৹ টাকা

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"
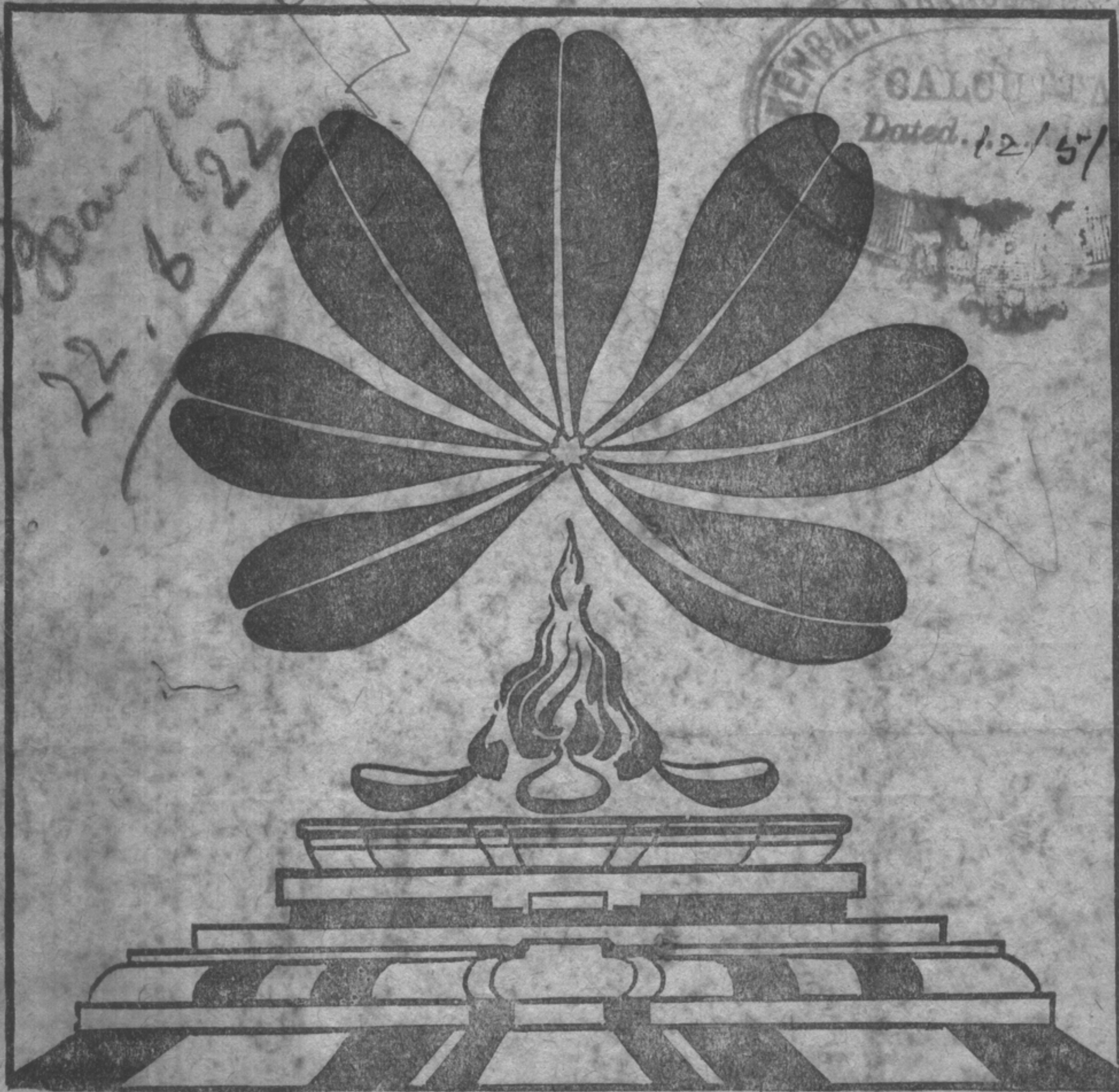
৩য় বর্ষ | বৈশাখ, সন ১৩২৯ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা

মন্দির।

৬ই মাঘ ১৩২৮।

(মহর্ষি দেবের মৃত্যু দিনে)

গত ৭ই পৌষ যাঁর দীক্ষাদিনের সাম্বৎসরিক উৎসব আমাদের আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে,—আজ একমাস পরে তাঁরই মৃত্যুর স্মরণের সাম্বৎসারিক দিনে আমরা একত্রিত হয়েছি।

আমরা যারা জীবন পথের পথিক—তাদের তিনি তাঁর জীবনের যে দীক্ষা তা পাথেয় স্বরূপ দিয়ে গেছেন। সেই দান তাঁর এই আশ্রমে আকার ধারণ করেছে—এখানকার সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের মধ্যে তাঁর পূজার অর্ঘ্য সঞ্চিত হয়ে আছে। তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে যা দিয়েছেন তা আমরা প্রত্যক্ষ ভাবে পাচ্ছি,—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে যে অনন্ত জীবনের মধ্যে তিনি গেছেন, তার যাওয়ার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলে ও আছে—কারণ যাঁর যথার্থ কিছু দেওয়া হয়েছে মৃত্যুর যবনিকার অন্তরালে তিনি অন্তর্হিত হন না।

মৃত্যুতে অন্তর্ধান ঘটেনা, দূরত্ব ঘটেনা, মানুষ যেখানে অমৃতকে লাভ করেছে সেখানে সে মৃত্যুকে অতিক্রম করে গেছে, এইটি আজ স্মরণ করবার দিন।

আমার শয়নগৃহে যে ধুপ সন্ধ্যার সময় জ্বালা হয়, ক্রমে সে নিবে যায়, যখন রাত্রে শুতে যাই তখন আর কিছুই থাকে না। কালও ছিল না, পাত্রটি ভস্মে আচ্ছন্ন হয়েছিল। আজ প্রত্যুষে ঘুম ভেঙ্গে দেখি ধূপের গন্ধে সব ঘর ভরে উঠেছে, ধুপপাত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ভস্ম নেই। এরকম কখনও হয়নি।—এতে আমার মনে এই কথাটি লাগল। আমাদের দেশে বহু প্রাচীনকালে তপস্যার যে অগ্নি বিশুদ্ধরূপে জ্বলেছিল, যার গন্ধে দিগদিগন্ত আমোদিত হয়েছিল—কখন্ সে ভস্মাচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রত্যেক দেশেই তার সাধনার শ্রেষ্ঠ সত্য কোনো না কোনো সময়ে মলিন হয়ে আসে। শতাব্দীধরে সে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেও পারে—কিন্তু সেই যে আগুন যাকে তিরোহিত মনে হয়েছে, ভস্মই যার প্রধান জিনিস

বলে' মনে হয়েছে—হঠাৎ দেখি সে জ্বলে উঠে সকল দিক আমোদিত করছে। এমনি করে সকল দেশের সত্য সাধনার ধন অন্তর্হিত হয়ে গিয়েও কোনও না কোনও মানুষের চিত্তে জাগ্রত হয়; রুদ্ধদ্বার চারদিকে, একটা কোথাও দরজা খোলা পেয়ে অন্তরে এসে আঘাত করে। আজকে যাঁর স্মরণের দিন, তাঁর জীবনে এইটি বিশেষ করে দেখেছি।

উপনিষদের ঋষিরা যে সত্যকে জ্বালিয়েছিলেন, নানা আবরণের মধ্যে তার দীপ্তি প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন কালের জ্ঞানসম্পদের প্রতি মুখে শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেও আমাদের জীবন থেকে তা দূরে সরে গিয়েছিল।

অথচ এই জ্ঞানের ধারাটি বিলুপ্ত হয়নি—নানা লোকের মধ্য দিয়ে অন্তঃসলিলা নদীর মত তা গূঢ়ভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। হঠাৎ এই একজনকে দেখলুম, যিনি অকারণে কিছুতেই বোঝা যায় না কেন—যা তাঁর চারদিকে কোথাও ছিল না, যাকে জানতেনও না, তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। কোথা থেকে তাঁর অভাব বোধ এল—সে কি ব্যাকুলতা! —আমাদের ইতিহাসের মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, ভারতবর্ষের সেই চিরকালের সাধনার ধন খোঁজবার প্রেরণা তাঁর হঠাৎ এল।

আমাদের জাতীয় অভ্যাস, ব্যক্তিগত অভ্যাস, ক্রমে উচ্চ হয়ে আমাদের কারাগার হয়ে ওঠে। চিরাগত অভ্যাসের দোষ এই—মানুষের চিত্তকে আলস্যের দ্বারা সে জড়ীভূত করে দেয়। অভ্যাস হচ্ছে নানা লোকের চিন্তায় আচারে খেয়ালে তৈরি করা পাথরের দুর্গ, আমাদের অলস চিত্ত এর মধ্যে আশ্রয় নিতে চায়, এই আশ্রয়ের ভিতর বসে সে ভাবে, 'পেয়েছি'।—কিন্তু এই দেওয়াল, চিত্তকে সত্যের সঙ্গে অব্যবহিত ভাবে যুক্ত না করে বিচ্ছিন্ন করে। এই অভ্যাস প্রচণ্ড আঘাতে যখন ভেঙ্গে যায়, তখনি আমরা সত্যের মুখোমুখি হতে পারি। মহর্ষির মনও বাল্যকাল থেকে দেশের, পরিবারের, আচরণ পদ্ধতি এবং অভ্যাসের দ্বারা জড়ীভূত ছিল। তাঁর চিত্ত স্বভাবত ভক্তি প্রবণ ছিল; তাঁর দিদিমা প্রভৃতি যে অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকতেন তার সঙ্গে তাঁর প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ আজন্মকাল থেকে দৃঢ় হয়েছিল—কিন্তু এমন সময় দিদিমার মৃত্যু যখন তাঁকে আঘাত করলে তখন তিনি বুঝলেন যে, যে সব অভ্যাসের দ্বারা তিনি পরিবৃত, তা তাঁকে সেই সত্যের পরিচয় দিচ্ছিল না যা মৃত্যুর ক্ষতির মধ্য দিয়ে অমৃতের পরিপূর্ণের অভিজ্ঞতায় নিয়ে যায়।

মৃত্যুর আঘাত অমৃতের অভিজ্ঞতায় সচেতন করে তুলবে এই তার প্রধান কাজ। কিন্তু মৃত্যু-শোকও জড়তার দ্বার না ভাঙতে পারে, যদি আমাদের আবরণ কঠিন ও আমাদের প্রাণের তেজ কঠিন থাকে।

মহর্ষি শিশুর মত জাগ্রত হয়ে তাঁর ক্ষুধার অন্নের জন্য চারদিকে চাইলেন, অনেক খুঁজলেন, কোথাও অমৃতকে পেলেন না; মনে হল মৃত্যু সবশেষে নিয়ে গেল, তার ঊর্দ্ধে কিছুই নেই। তবুও তিনি অনুভব করলেন সত্য রয়েছেন, কিন্তু কোনও বাধাবশত তাকে পাচ্ছি না।

তিনি শাস্ত্র প্রভৃতির মধ্যে পথ খুঁজতে লাগলেন, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করলেন, নানা পণ্ডিতকে নিয়ে নানা সন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। হঠাৎ একদিন একটি ছিন্ন পত্র উড়ে এল ঈশোপনিষদের বাণী নিয়ে:—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্ যৎকিঞ্চ জগত্যাম্ জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্—"

ঈশ্বরের দ্বারা সবকে আচ্ছন্ন করে দেখবে—যা কিছু আছে যা কিছু চলছে, ত্যাগেরই দ্বারা লাভ করবে, লোভ করবে না। এ ছিন্ন পত্রের অর্থও তখন তিনি জানতেন না—পণ্ডিতের কাছে গেলেন এর অর্থ বুঝে নিতে। তখন থেকে উপনিষদের সাধনা তাঁর জীবনকে পরম আশ্রয় দিয়ে এসেছে।

আমাদের ঋষিরা যে মন্ত্র দেখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন তাকে প্রমাণ করবার ভার আমাদের প্রত্যেকের উপর আছে—যতক্ষণ সে শুধু পুঁথির মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তা হয় না। আমাদের দেশে এমন কথাও শোনা যায়—এ সব বড় ভাব, বড় কথা, মুনি ঋষিদের জন্য, সংসারীর পক্ষে ওসব নয়। আমাদের সাধকেরা, যে সত্যকে জীবনে লাভ

করেছিলেন তাকে এর চাইতে আর কোনমতে বেশী তিরস্কৃত করা যায় না। তাঁরা বলেছেন তাঁকে না পেলে "মহতী বিনষ্টি:"— এ যদি তোমার জীবনের ভিতর দিয়ে না জানলে তবে সমস্ত জন্ম ব্যর্থ হয়ে গেল, এত বড় বিনাশ আর নেই। সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকে বিশ্বাস কর, অভ্যাসের দ্বারা জড়িত হয়ে থেকো না, দুর্ব্বলআত্মাকে আলস্যে মগ্ন করে এত বড় বাণীকে অপমানিত করতে দিও না।

আমাদের দেশের সত্যকে নিজের জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—চন্দন সিন্দুর দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখে তাকে শুধু মুখের পূজা দেননি। পাপতাপ সুখদুঃখের দ্বারা তরঙ্গায়িত এই সংসারের মধ্যেই সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" কে জীবনে পাওয়া যায়—যদি কিছু বড় জিনিস জীবনে পেয়ে থাকি, তাঁর সংস্পর্শে এই বিশ্বাসকে পেয়েছি।

সত্যের জন্য যাঁদের ব্যাকুলতা আছে তাঁরা তাকে নিজের চারিদিকে পান, তাঁদের আর কিছুর দরকার হয় না। অন্যেরা বাইরের জিনিসকে সত্যের পরিবর্ত্তে নেন। সত্যের সাধনা না করে আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা তাকে পাবার চেষ্টা, ঘুষ দিয়ে লাভের চেষ্টার মতই মানুষের একটা বড় মোহ। একান্ত ভাবে আকাঙ্ক্ষা না জাগলে সেই আকাঙ্ক্ষিত পরম ধন পাওয়া যায় না। শুধু মুখের কথায় নয়—তাঁর ধন প্রাণ, দীর্ঘজীবনের সব শোক দুঃখ বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে, তাঁর সেই পরম আশ্রয় শিবম্, শান্তম্ এর যোগ কোনও দিন বিচ্ছিন্ন হতে তিনি দেননি; 'সত্যং' তাঁর কাছে তাঁর ঘরের দেওয়ালের মতই সত্য ছিলেন। সেই পরম পুরুষকে জীবনের সব ক্ষেত্রকে পূর্ণ করে যেমন তিনি দেখেছিলেন—তেমনি ভারতবর্ষের সেই বড় সাধনা ইতিহাসের নানা যবনিকায় যা আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, মনকে নির্ম্মল করে, জীবনকে বিশুদ্ধ করে তাকে প্রকাশ করা—এও তাঁর জীবনের সাধনার বস্তু ছিল। কোনও সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়ে তিনি এ চেষ্টা করেন নি, তিনি জানতেন সম্প্রদায় নানা বাধাগ্রস্ত—নানা স্থূলতা, নানা ক্ষুদ্রতা সেখানে সত্যকে অস্পষ্ট ও বিকৃত করে তোলে। শেষ জীবনে বার বার তাঁর মুখ থেকে শুনেচি এই শান্তিনিকেতনেরই মধ্যে তাঁর জীবনের সার্থকতা নিহিত। এই শান্তিনিকেতনে যেখানে কোনও সম্প্রদায়ের নূতন বা পুরাতন আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়ে ওঠেনি, যেখানে উন্মুক্ত আকাশ, অবারিত আলোক—এইখানে তিনি কিছু পেয়েছেন, কিছু দিয়েছেন। "অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও" এই প্রার্থনা এই আশ্রমের অন্তরে তিনি দান করে গেছেন—যে প্রার্থনা বহুকাল থেকে চলে এসেছিল, যা মানুষ বিস্মৃত হয়েও হয় না—চিরকালের সেই প্রার্থনা তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের দান করে গেছেন।

গাছ, মাটি থেকে বাতাস থেকে, সূর্য্যের আলো থেকে খাদ্য ও তেজ আহরণ করে আনে, সে তার নিজের জিনিস নয়—কিন্তু তাকে নিজের জীবন দিয়ে ফলাতে হয়। তিনি এই ব্যাকুল প্রার্থনা তাঁর জীবনে ফলিয়ে গেছেন, তাই এই মন্ত্রটি আজ এত সহজ গম্য হয়েছে। তাঁর মুখ থেকে যা পেয়েছি, তাঁর মৃত্যুর দিনে তা উচ্চারণ করে আজকের কাজ শেষ হোক্—

"অসতোমা সদ্গময়—"।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রথম চিঠি

বধূর সঙ্গে তার প্রথম মিলন, আর তার পরেই সে এই প্রথম এসেচে প্রবাসে।

চলে যখন আসে তখন বধূর লুকিয়ে কান্নাটি ঘরের আয়নার মধ্যে দিয়ে চকিতে ওর চোখে পড়ল। মন বল্লে "ফিরি, দুটো কথা বলে আসি।" কিন্তু সেটুকু সময় ছিল না।

সে দূরে আস্‌চে বলে একজনের দুটি চোখ বেয়ে জল পড়ে তার জীবনে এমন সে আর কখনো দেখেনি।

পথে চলবার সময় তার কাছে পড়ন্ত রৌদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল। সেই অসীম ব্যথার ভাণ্ডারে তার মত একটি মানুষেরও নিমন্ত্রণ আছে সেই কথা মনে করে, বিস্ময়ে তার বুক ভরে উঠ্‌ল।

যেখানে সে কাজ করতে এসেচে সে পাহাড়। সেখানে দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মত পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে, আর ছোট ছোট ঝরণা কা'কে যেন আড়ালে আড়ালে খুঁজে বেড়ায়, লুকিয়ে চুরিয়ে।

আয়নার মধ্যে যে ছবিটি দেখে এসেছিল আজ প্রকৃতির মধ্যে প্রবাসী সেই ছবিটিরই আভাস দেখে, নববধূর গোপন ব্যাকুলতার ছবি।

২

আজ দেশ থেকে তার স্ত্রীর প্রথম চিঠি এল।

লিখেচে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো এসো, শীঘ্র এসো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

এই আসা যাওয়ার সংসারে তারও চলে যাওয়া তারও ফিরে আসার যে এত দাম ছিল একথা কে জান্‌ত? সেই দুটি আতুর চোখের চাউনির সামনে সে নিজেকে দাঁড় করিয়ে দেখ্‌লে, আর তার মন বিস্ময়ে ভরে' উঠ্‌ল।

ভোর বেলায় উঠে' চিঠি খানি নিয়ে দেবদারুর ছায়ায় সেই বাঁকা পথে সে বেড়াতে বেরল। চিঠির পরশ তার হাতে লাগে, আর কানে যেন সে শুন্‌তে পায়, "তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমার জগতের সমস্ত আকাশ কান্নায় ভেসে গেল।"

মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "এত কান্নার মূল্য কি আমার মধ্যে আছে?"

৩

এমন সময় সূর্য্য উঠ্‌ল। পূর্ব্বদিকের নীল পাহাড়ের শিখরে দেবদারুর শিশির-ভেজা পাতার ঝালরের ভিতর দিয়ে আলো ঝিলমিল্ করে উঠ্‌ল।

হঠাৎ চারিটি বিদেশিনী মেয়ে দুই কুকুর সঙ্গে নিয়ে রাস্তার বাঁকের মুখে তার সামনে এসে পড়্‌ল। কি জানি কি ছিল তার মুখে, কিম্বা তার সাজে, কিম্বা তার চাল চলনে।—বড় মেয়ে দুটি কৌতুকে মুখ একটু খানি বাঁকিয়ে চলে গেল। ছোট মেয়ে দুটি হাসি চাপবার চেষ্টা করলে, চাপ্‌তে পারলে না; দুজনে দুজনকে ঠেলা ঠেলি করে খিল খিল করে হেসে ছুটে গেল।

কঠিন কৌতুকের হাসিতে ঝরনাগুলিরও সুর ফিরে গেল। তারা হাততালি দিয়ে উঠ্‌ল। প্রবাসী মাথা হেঁট করে চলে আর ভাবে—"আমায় দেখার মূল্য কি এই হাসি?"

সেদিন রাস্তায় চলা তার আর হল না। বাসায় ফিরে গেল; একলা ঘরে বসে চিঠিখানি খুলে পড়্‌লে, "তুমি কবে ফিরে আস্‌বে? এসো এসো, শীঘ্র এসো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গান।

ও মঞ্জরী ও মঞ্জরী
আমের মঞ্জরী
আজ হৃদয় তোমার উদাস হয়ে
পড়চে কি ঝরি ?
আমার গান যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি।
পূর্ণিমা চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়,
(ঐ) দখিণ বাতাস গন্ধে পাগল
ভাঙল আগল
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি ॥

২৮শে ফাল্গুন
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায়
তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায়
একটি ধারে।
আমি শুনব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায়
তার বাঁধিব বারে বারে ॥
আমার নীরব বেলা সেই তোমারি
সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মত
উঠ্‌বে পূরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে,
হৃদয়ে মোর গানের তারা
উঠ্‌বে ফুটে সারে সারে ॥

ফাল্গুন পূর্ণিমা।
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের প্রভাব।

(আচার্য্য সিলভ্যাঁলেভির, 'বিশ্বভারতী'তে ১৯২১ সালে ১১ই হইতে ২১শে নবেম্বর পর্য্যন্ত প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।)

১৮।১১।২১

অধ্যাপক আজ পূর্ব্বদিনের হিতাইতদের সম্বন্ধে আলোচনার অনুবৃত্তি করেছেন। হিতাইতরা আর্য্যজাতি কি না সে সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে। এসিরিয়ন ও ব্যাবিলোনিয়নরা যে অক্ষর ব্যবহার করত, পাশ্চাত্যরা তার নাম রেখেছেন কিউনিফরম। এ শব্দটি ল্যাটিন-cuneus থেকে এসেছে; এরমানে হচ্ছে "wedge"--পেরেকের মত মোটা আরম্ভ থেকে এর সব অক্ষর ক্রমে সরু হয়ে গেছে বলেই বোধ হয় তাঁরা একে 'কিউনিফরম' বলেছেন। প্রাচীনকালে দুরকম অক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—এক রকম ভাবের চিত্র, অন্যটা শব্দ বিশেষ প্রকাশ করে। কিন্তু হিতাইতদের যে সব লেখা পাওয়া যাচ্ছে--সে গুলো বিশুদ্ধ নয়, তারা যুক্ত, এই দুই রকমের সম্মিলন থেকে তারা হয়েছে। হিতাইতদের শিলায় খোদিত Hieroglyphics এর পাঠোদ্ধার করেছেন,—১৯১৪ খৃঃ অঃ এক জন অষ্ট্রীয় পণ্ডিত—Hrozny। এ নিয়ে পণ্ডিত সমাজে খুব আলোচনা চলেছে।

হিতাইতরা তাদের 'ভাবলিপি' কতকটা অ্যাসিরিয় শব্দচিত্র এবং কতকটা নিজেদের বিশেষ বিশেষ অক্ষর যোজনার দ্বারা করেছে---ইতিহাসে অন্যত্রও এর নিদর্শন আছে। জাপানীরাও প্রাচীন কালে এই কাজ করেছে। জাপানী তার 'কা' 'কি' প্রভৃতি ভারতবর্ষের কাছে পেয়েছে। চীনদেশেদুরকমের হায়রোগ্লিফিক প্রচলিত ছিল, এক রকম সর্ব্বসাধারণের জন্য, অন্যটা বিশিষ্টদের জন্য। জাপানী চীনের এই সব কথায় ভারতবর্ষ থেকে পাওয়া প্রত্যয় যোগ করে নিজের ভাষা লেখার পদ্ধতি বের করেছে।

অ্যাসিরিয় রাজাদের কোষাগারের দপ্তরের মধ্যে প্রাপ্ত নানা বিদেশের নাম এবং সেই সব ভাষার শব্দের একটি তালিকা, জার্ম্মানীর বিখ্যাত পণ্ডিত Detitsch ১৯১৪ খৃঃ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে কতক শব্দ যা পাওয়া গেছে তা আশ্চর্য্য। তার একটি কথা হচ্ছে দান্‌তে (বহুবচনের রূপ), তার মানে "giving" দান করা। তেমনি সংখ্যাবাচক শব্দও পাওয়া গেছে এক, তিন পাঁচ প্রভৃতি।

এখনকার চেকোশ্লোভাকিয়ার হোশনি প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন—হিতাইতদের ভাষা ইণ্ডোইয়োরোপীয় সংস্কৃত গ্রীক প্রভৃতির সম-জাতীয়। অধ্যাপক মহাশয়ের মতে, প্রমাণ যে সব আছে তাতে এঁদের অনুমানকে কাল্পনিক বলা যেতে পারে। আর্য্য ভাষার সাদৃশ্য দেখে যে অর্থ সেই সব শব্দে তাঁরা আরোপ করেছেন তা তাদের মোটেই নয়, কাজেই তাঁদের এই অনুমান অগ্রাহ্য।

হিতাইতদের অনেক কথা যে আর্য্যভাষা থেকে পাওয়া তা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে তাঁরা আর্য্য ছিলেন। এসিয়া মাইনর তৎকালের সভ্য জাতিদের মিলনের ক্ষেত্র ছিল। এখানে যেমন সংস্কৃত দেবতার নাম পাওয়া গেছে, "শেষ" প্রভৃতি পণ্ডিত দেখিয়াছেন তেমনি গ্রীক প্রভৃতি আর্য্য ভাষার সঙ্গেও তাদের অনেক কথার ঘনিষ্ট যোগ আছে।

তা হলে বলতে হবে, আর্য্য সভ্যতার দুই প্রবাহ, একধারা পূর্ব্বে অন্যধারা পশ্চিমে যাবার সময়, এসিরিয়া ব্যাবিলন কক্কশস্ প্রভৃতি যে সব দেশ দিয়ে গেছে, তার সঙ্গে তাদের যোগ হয়েছে। কিছু তারা নিয়েছে কিছু দিয়েছে। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০০ শতাব্দীতে এই দুই ধারার, এসিয়ামাইনরে প্রাচীন জাতিদের সঙ্গে যে ঘনিষ্ট যোগ হয়েছিল তার প্রমাণের অভাব নেই।

ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি যে খৃষ্ট পূর্ব্ব সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে প্রবেশ করেছিলেন, অধ্যাপক মহাশয়ের মতে তা মনে করার মত প্রমান নেই।

খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী মানব ইতিহাসের একটি আশ্চর্য্য সময়। হঠাৎ সে সময়ে আর্য্য জাতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। ফুলের মত ফুটে উঠে তার সভ্যতা চারদিকে তখন ছড়িয়ে পড়ছে, তার একটি পরিণতির বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকেরা আইয়োনিয়াতে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেচে। আর্য্য জাতির এক শাখা,—ইট্রসিয়রা, রোমে গিয়ে বাস করছে। গ্রীক অক্ষরে এই সময়ে লেখা ১৫০০ শ্লোক মমির মধ্যে পাওয়া গেছে। ইউফ্রেটিসের ধারে ধারে আর্য্য জাতির একটি বিপুল প্লাবন তখন পূর্ব্বদিকে গড়িয়ে চলেছে; সমস্ত পৃথিবীতে অকস্মাৎ সভ্যতা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। ইতিহাসে এ একটা মস্ত ঘটনা।

১৯।১১।২১

মিতানি রাজ্য সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনার দরকার আছে। বৈদিক যুগের একটা ইতিহাস এর মধ্যে জড়িয়ে আছে। মানচিত্রে ইউফ্রেটিস নদীর বাঁকের মধ্যে এই জায়গাটি পার হয়ে সেকালে লোকে ইয়োরোপ থেকে এসিয়া মাইনুরে আসত—সমুদ্র পথে বেশীদূর কোথাও যাওয়া তখনও সম্ভবপর হয় নি—ডাঙ্গাপথে ক্রমে ক্রমে আর্ম্মিনিয়া মিতানি হয়ে পারস্য উপসাগরে আসবার সহজ পথ মিতানির ভিতর দিয়ে ছিল—ক্রমে সেখান থেকে বোলান পাস্ পার হয়ে ভারতবর্ষে আসা যেত। ২২০ খৃষ্টাব্দে যে বংশ চীনদেশে রাজত্ব করতেন তাঁদের কথা প্রসঙ্গে রোমক সাম্রাজ্যের পথের বর্ণনা আছে—মরুভূমি পার হয়ে এই পথ মিতানির ভিতর দিয়ে গেছে। এই জায়গাটি সকলের মিলন কেন্দ্রের মত ছিল, এখানে সকলকে মিলতেই হত। পশ্চিম পূর্ব্বের এই চৌমাথা পথ, বৈদিক ভারতীয়দের আগমনের প্রবাহ পথ নিঃসন্দেহ একদিন ছিল। এসিরিয়রা ভারতীয় আর্য্যদের কাছে কিছু পেয়ে থাকলে এখানেই তা পাবার সম্ভাবনা ছিল। আরও অনেক প্রাচীন যাত্রীদের সঙ্গে এঁদের মিলন হয়ে থাকবে। বৈদিক ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির সংস্পর্শেই এই রকম করে এসেছিল এবং নিঃসন্দেহ নানা দিক থেকে তাদের আদান প্রদান হয়ে থাকবে। আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়ার ঘনিষ্ট সংস্পর্শে ভারতবর্ষ কি করে এসেছিল, এই আলোচনা থেকে কতকটা আমরা বুঝতে পারি।

২০।১১।২১

ভারতীয় ও ব্যাবিলোনীয় সভ্যতার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে কি না, সে বিষয় নিয়ে অনেক দিন থেকে আলোচনা চলছে। সেই আলোচনা প্রথম আরম্ভ করেন James keoxnedy. তিনি ১৮৯৬ সালে রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে "Early commerce of India with Bebylonia" নামে একটী প্রবন্ধ লেখেন। তাতে তিনি বলেন যে খৃঃ পূঃ ৭৮০ অব্দে ভারতবর্ষ ও ব্যাবিলনের মধ্যে বাণিজ্যের যোগ ছিল।

একটী উদাহরণ দিলে ভারতের ব্যাবিলনের উপর প্রভাব বেশ স্পষ্ট বোঝা যাবে। হেরোডোটাস্ তাঁর বইতে "sindon" বলে এক রকম কাপড়ের উল্লেখ করেছেন। আসুরবাণিপালের গ্রন্থশালাতেও (৬৬৮-৬৩৬ খৃঃ পূঃ) এ শব্দটীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। এ কাপড় ভারতবর্ষ থেকে জলপথেই ব্যাবিলনে যেত, স্থলপথে যদি পারস্যের মধ্যে দিয়ে যেত, তবে "সিন্দন" শব্দটীর "স" "হ" রূপ ধারণ করত।

এবার ভারতের উপর প্রভাবের কথা বলব। ঋগ্বেদে ৮ম মণ্ডলে ৭৮ সুক্তে ২য় মন্ত্রে "মনহিরণ্য" শব্দ পাওয়া যায়। এখন "মন" শব্দটী সংস্কৃত বলে মনে করলে, এর কোন মানেই হয় না। এটী মূলে আসিরীয় শব্দ, একে এখানে আসিরীয়ভাবে 'পরিমাণ' অর্থে ধরতে হবে। এ রকম দৃষ্টান্ত নানাদিকে আছে। ভারতীয়রা যেমন বিদেশীয়দের দান করেছে তেমনি গ্রহণ করতেও তাদের কুণ্ঠা ছিল না।

শতপথ ব্রাহ্মণে যে জলপ্লাবনের কাহিনী আছে সেটী আসিরীয় প্রলয় প্লাবনের অনুকরণ বলে মনে হয়। কারণ যদিও আসিরীয় সাহিত্যে এ কাহিনী নানারূপে দেখা যায়,

বৈদিক সাহিত্যে একবার মাত্র একে দেখতে পাই। এই রকমে দুই দেশের সভ্যতার আদান প্রদানের ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে আসে।

২১।১১।২১

আজ আমরা পারস্যের সঙ্গে ভারতের যোগের কথা বলব। এইবার আমরা ঐতিহাসিক যুগের গণ্ডীর মধ্যে আসছি।

পারস্যের সঙ্গে ভারতের যে যোগ তার আরম্ভ হচ্ছে সাইরাসের সময় থেকে (৫৪৯-৬২৯ খৃঃ পূঃ)। তিনি ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কপিশ (Kapissa) বলে এক নগর অধিকার করে ধ্বংস করেন। এর উল্লেখ আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে পাই।

তার পর ভারতীয়রা পারসিকদের সংস্পর্শে আসে দারিয়াসের সময়ে। ব্যাবিলন জয় করে তিনি Archosia অধিকার করেন। এটীকে অনেকে সরস্বতী বলে থাকেন। তাঁর বড় কাজ হচ্চে—সিন্ধুনদী আবিষ্কার করবার জন্যে একটি অভিযান পাঠান। সে অভিযানের নায়ক ছিলেন—Seylex বলে এক গ্রীক।

ডারিয়াসের অনেক অনুশাসন আবিস্কৃত হয়েছে, অনেকে মনে করেন তারই অনুকরণে অশোক তাঁর লিপি বার করেন। তবে দারিয়াস কেবল রাজাদের কথাই বলেছেন, অশোক ন্যায় ধর্ম্মের কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর অনুশাসনে আমরা গান্ধার ও হিন্দুকুসের উল্লেখ পাই।

এইবার আমরা বভেরু জাতকের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। বভেরু জাতক থেকে আমরা জানতে পারি যে ভারত থেকে কতকগুলি বণিক প্রথমে কাক ও পরে ময়ূর বিক্রয় করতে বভেরু রাষ্ট্রে যায়।

১৮৭০ সালে প্রথমে পণ্ডিত Minayeff বলেন যে বভেরু অর্থে ব্যাবিলনকেই বোঝায়। জাতকের লেখক এশব্দটী বোধ হয় পারসিকদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, কারণ পারসিক ভাষায় "ল" স্থানে "র" হয়।

অনুমান ৪৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীসে ময়ূরের কথা শোনা যায়। সে সময় Pericles এর এক বন্ধুই প্রথম ময়ূর গ্রীসে আমদানি করেন— সম্ভবত পারস্য থেকেই। প্রাচীন আসিরীয় সাহিত্যে ময়ূরের কোথাও উল্লেখ নেই। সীসীরোর সময়ে (ক খৃঃ পূঃ) কেবল ধনী গ্রীকরা ময়ূরের মাংস আহার করতে পারত। অশোকের সময়েও ভারতে ময়ূরের মাংস আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হত।

মনে হয় পারস্য থেকেই ক্রমশঃ ময়ূর গ্রীসে প্রচলিত হয়েছে।

মাটির গান।

ফিরে চল্ মাটির টানে;
যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে
মুখের পানে।
যার বুক ফেটে এই প্রাণ উঠেচে,
হাসিতে যার ফুল ফুটেচে রে,
ডাক দিল যে গানে গানে।
দিক্ হতে ঐ দিগন্তরে
কোল রয়েচে পাতা,
জন্মমরণ ওরি হাতের
অলখ সুতোয় গাঁথা।
ওর হৃদয়-গলা জলের ধারা
সাগর পানে আত্মহারা রে,
প্রাণের বাণী বয়ে আনে॥

২৩শে ফাল্গুন
১৩২৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশ্রম-সংবাদ

পূজনীয় গুরুদেব প্রায় একমাস কাল শিলাইদহে কাটাইয়া গত ২৭শে চৈত্র আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সি এফ অ্যাণ্ড্রুজ ও তাঁহার সহিত শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আচার্য্য লেভি ও তাঁহার পত্নী নেপালযাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত বিশ্বভারতীর ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। নেপালে অনেক প্রাচীন মূল্যবান্ পুঁথি আছে সেগুলির উদ্ধার করিবার বাসনা লেভি সাহেবের আছে।

ফরাসী—সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসী শ্রীযুক্ত বেনোয়া আশ্রমে বাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। ইনি নানা ভাষাবিদ অভিজ্ঞ অধ্যাপক, ইঁহাকে পাইয়া বিশ্বভারতী বিশেষ লাভবান হইয়াছে।

আগামী ২৭শে এপ্রিল হইতে ২৬শে জুন পর্য্যন্ত গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে বিশ্বভারতী বন্ধ থাকিবে।

আশ্রমে দিন দিন বাড়িঘর ও লোকজনের বাস বাড়িতেছে। যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলো আশ্রমে জ্বালা হইত তাহা যথেষ্ট নহে বলিয়া একটি নূতন এঞ্জিন ও ডাইনামো আসিয়াছে। ইহাতে সাতশত বাতি জ্বলিতে পারিবে।

এণ্ড্রুজ সাহেব প্রায় একমাস কাল রেলওয়ে ধর্ম্মঘটের মীমাংসার জন্য ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছেন।

গত ৭ই ও ৮ই চৈত্র ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আশ্রমবাসী সকলের নিকট জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন ই, আই, আর এর এজেন্ট ধর্ম্মঘটকারীদের যাহা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আশাতিরিক্ত এবং তাহা গ্রহণ করিলে সবদিক দিয়া কল্যাণকর হইত। এখন ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইতেছে তাহাতে হিংসা বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিবে, দাঙ্গাহাঙ্গামা রক্তপাত নিবারণের সাধ্য কাহারও থাকিবে না। রাষ্ট্রনীতি নির্ম্মম, সহস্র সহস্র নিরপরাধ নরনারীর সমস্ত সুখ দুঃখ কল্পিত তুচ্ছলাভের আশায় বলিদান দিতে সে কুণ্ঠিত নহে, এইটিই আমাদের উৎকণ্ঠার বিষয়।—"আমাদের আশ্রমের তপস্যা সত্য হোক, সমস্ত বিরোধ বিক্ষোভের উপরেও আজিকার দুর্দ্দিনে এখানকার কর্ম্ম কল্যাণ এবং শান্তির ধারা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র অবারিত হোক, তাঁহার চরণে এই আজ আমাদের একান্ত কামনা যেন হয়!"

গত সাহিত্য-সভায় ছাত্রগণ একটি হাস্যকৌতুক অভিনয় করিয়াছিল। তাহাতে গুজরাটি পার্শি, বার্ম্মিজ ছাত্রগণও অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। অভিনয় বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

প্রসাদ বিদ্যালয়—আশ্রমসন্নিকট হিন্দুমুসলমানপ্রধান ভুবনডাঙা গ্রামে "প্রসাদ বিদ্যালয়" নামে যে পাঠশালা আছে তাহাতে দুইবেলাই পড়ানো হইতেছে। সকালে ও বিকালে পড়াইবার জন্য দুইজন শিক্ষক আছেন। দুই বেলায় গড়ে ২১।২২ জন ছাত্র উপস্থিত থাকে। ইহার জন্য একটি তহবিল আছে নিম্নশ্রেণীর হিত-সাধন সমিতি ও ইহার জন্য মাসিক দুই টাকা সাহায্য পাঠাইয়া থাকেন।

আশ্রমের নিকটবর্ত্তী সাঁওতাল গ্রামের সুহৃৎ বিদ্যালয় আজকাল নৈশবিদ্যালয় হইয়াছে। সারাদিন সাঁওতাল বালকেরা কাজকর্ম্মে এরূপ লিপ্ত থাকে যে দিনের বেলায় তাহারা সময় পায় না সেইজন্য রাত্রিকালে তাহাদের পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মাঝে মাঝে বালকদিগকে ছায়াচিত্র দেখান হইয়া থাকে। আশ্রমে আসিয়া সাঁওতাল বালকগণ মাঝে মাঝে ফুটবল খেলিয়া যায়।

গত ২৩শে চৈত্র স্বর্গীয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহার পিতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গ্রামের বালকদিগকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত অর্থ পাঠা-

ইয়াছিলেন। সে দিন দুই বিদ্যালয়ের ৪৮জন ছাত্র লুচি মিষ্টান্ন ইত্যাদি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াছিল।

গত ২৪শে ফাল্গুন অপরাহ্ণ সাড়ে চার ঘটিকার সময় পূজনীয় গুরুদেবের গৃহে বিশ্বভারতী সম্মিলনের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে যে আলোচনায় নিযুক্ত আছেন সে সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বাংলা ভাষার মঙ্গল গ্রন্থমালা যে মূলতঃ বৌদ্ধ দর্শনের নিকট ঋণী ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যুক্ত একথা ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মমঙ্গলের জগৎ সৃষ্টির ধারণা ও বৌদ্ধ দর্শনের জগৎ সৃষ্টির ধারণার মধ্যে যে ঐক্য আছে বক্তা তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার আলোচনা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। গুরুদেব তাঁহার সংগৃহীত ধর্ম্মমঙ্গলের গানের কয়েকটি এই সভায় পড়িয়া শোনাইয়াছিলেন।

গত চতুর্দ্দশীতে মহাত্মা গান্ধীর কারাবাসের খবর আসাতে অধিবেশন বন্ধ রাখা হইয়াছিল। পরের সভাতে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত মৌলভী জিয়াউদ্দীন পারসীক কবি সাদির একটি কবিতা আবৃত্তি ও তাহার অনুবাদ করিয়া শোনান। পরে সৈয়দমুজতবালী ওমার খৈয়াম সম্বন্ধে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধে তিনি Fitzerald এর অনুবাদ হইতে বাংলা অনুবাদ করাতে কবির উপর যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে Fitzerald ওমারের কবিতার প্রকৃত অনুবাদ করেন নাই। তাঁহার কবিতাবলী হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া আপন ইচ্ছামত সাজাইয়া নিজের ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে কবিকে নাস্তিক বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক অথচ ওমার নাস্তিক ছিলেন না। এই প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় বলেন—এই সকল অনুবাদকে ভিত্তি করিয়া অনেক দার্শনিক আলোচনা চলে এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়ত কবিকে মিথ্যার আবরণে ক্রমশঃ আবৃত করা হয়। মূল গ্রন্থের অনুবাদ আজও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত না হওয়া আক্ষেপের বিষয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী "পূর্ব্বমেঘের প্রথম শ্লোক" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সঙ্গীত বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীগণের চেষ্টায় গত ১৩ই চৈত্রের অধিবেশন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল।

কলাভবন।

মান্দ্রাজ Y. M. I. A. (1921 club) গত মার্চ মাসে এবৎসর প্রথম ভারতীয় শিল্পকলার একটি প্রদর্শনী খুলেছিল। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন Mrs annie Besant. Mr cousins এবং Mrs adiar। কলিকাতা I. S. O. A র তরফ থেকে এবং আশ্রমের কলাভবনের তরফ থেকে চিত্রকলা প্রদর্শিত হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে ক্লাবের সভ্যগণ বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অসিত কুমার হালদার মহাশয়কে বিশেষ ভাবে সেখানে আহ্বান করেছিলেন। প্রদর্শনী ১লা মার্চ থেকে ৮ই মার্চ পর্য্যন্ত খোলা হয়েছিল। প্রত্যহ সায়াহ্নে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। (১লা মার্চ) প্রদর্শনী খোলা উপলক্ষ্যে Lady Emily Lutyens (বঙ্গের ছবু-লাটের ভগ্নী এবং দিল্লীর রাজকীয় স্থপতী Sir Edwin Lutyens এর পত্নী) একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। তারপর Mrs Besant ও Mr cousins তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। (২রা মার্চ) দ্বিতীয় দিন Mrs annie Besant "what is an artist ?" (৩রা মার্চ) তৃতীয় দিন Mrs cousins "Beauty in Daily life" (৪ঠা মার্চ) Mr W. Hadaway "Art crafts of South India" (৫ই মার্চ) শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার "The Neo-Bengal School of Painting (৬ই মার্চ) Mr Jinarajadsa "Artistic Discrimination" এবং শেষে (৭ই মার্চ) Mr cousins "Indian Influence" in art beyond India বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

Mr cousins প্রদর্শনীর চিত্রকলা বিভাগের এবং

Mr adiar প্রদর্শনীর কারুশিল্প বিভাগের তত্ত্বাবধান করেন। চিত্র বিভাগটি তিনটি ঘরে সাজান ছিল। একটিতে প্রাচীন তাঞ্জোর একটিতে নবীন আধুনিক চিত্রকরদের চিত্র এবং অপর কোঠায় প্রাচীন মোগল, রাজপুত প্রভৃতির চিত্র (কুমারী মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্য) সাজান হয়েছিল। এই চিত্রশালাটি Mr cousins বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নসহকারে সাজিয়েছিলেন। Mrs adiar ও তাঁর কারু বিভাগটিতে মান্দ্রাজের প্রাচীন ধাতুমূর্ত্তি ও নানা প্রকারের অলঙ্কার বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যসম্ভারে সুচারুরূপে সাজিয়ে তুলেছিলেন। মান্দ্রাজ আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল Mr. U. Hadaway তাঁকে এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। প্রদর্শনী ছোট হলেও মোটের উপর খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। অল্পদিন যাবৎ খোলা থাকলেও অনেক বিশিষ্ট দর্শকের সমাগম হয়েছিল এবং তার ফলে কলাভবনের অধ্যাপক ও ছাত্রদের অনেক ছবি বিক্রি হয়েছিল।

Mrs annie Besart এর স্থাপিত গিণ্ডি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রদর্শনীতে কলাভবনের ছাত্র শ্রীমান অর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের "স্বাধীনতা" নামক একটি চিত্র দেখে মুগ্ধ হয়। তারা ছবিটি তাদের বিদ্যালয়ে রাখা উপযুক্ত বিবেচনা করায় স্কুলের কর্তৃপক্ষরা এবং বন্ধুরা সকলে মিলে চাঁদাকরে ছবিটি কিনে দিয়েছেন। বিদ্যালয়ে চিত্রটির আবরণ উন্মোচন উপলক্ষ্যে বিশেষ একটি সভা হয়। Mr cousins একটি বক্তৃতা দেন এবং তাঁদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের এবং বিশেষভাবে চ্যান্সেলার হিসাবে গুরুদেবের যে যোগ আছে তা উল্লেখ করেন। অসিতবাবু এই সভায় বিশেষভাবে আহুত হন, তাঁকে আশ্রম ও কলাভবন সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছিল।

* * * * *

কলাভবনের ছাত্র শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার গুপ্ত গত মাসের এবং এ মাসের "শান্তিনিকেতনের" জন্য স্বরচিত দুইটি ব্লক উপহার দিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বৈদেশিক সংবাদ।

বিদেশ হইতে যে সকল চিঠি পত্র আসে তাহার কিছু কিছু প্রকাশ করিতে আমাদের পাঠকদের অনেকে অনুরোধ করিয়াছেন নিম্নে দুইটি পত্র এবারে দেওয়া গেল।

28. 11. 21.
Wendsbek
Konigstr. 41.

My dear master.

Since the day we received your son's letter telling us abcut your plans concernning shantiniketan we have thought of nothing but this great scheme of yours. You know that our hopes for the Salvatiou of the west have long been resting in you and how ardently we wished you to come to our conntry, because we are convinced that here you would find the most fertile soil. I firmly believe that of all the nations of Europe the soul of Germany is most akin to that of India and that these two countries must join in their work. The Germany of Bismark lies thrown down but the true Germany and the Germany of Kant and Goethe and Schiller and Kleist lives and in this Germany you will find your ally.

While I am writing this letter my husband is writing to you at the same time and perhaps you have read his letter before you read mine and heard from him what has occupied our mind, these last weeks. So I will not repeat

what he has said, but only add that if this idea of his should meet your desires, if we could come and help you in carrying out your plans in Shantiniketan, it would seem to me as the fulfilment of our life, which could give a meaning to all our aspirations. I know that this call of yours, if it should come, would summon us to hard work, not to a flower's or bird's existence spent in singing hymns under palm trees, I know the value of what we should have to give up and perhaps leave behind us for ever, and yet that which is to be gained not for ourselves but for those we love is worth a thousand times more, and so I should gladly answer ; Here I am, my master.

Meanwhile I spend my time in spreading your message among my people. I am glad your letter arrived just in time to tell me about the alteration and additions in the manuscript, I was just going to give my translation to print. So I wait till the book arrives, I hope the German edition can yet come out before May. I wrote to your son that we should be very glad if you would send us a photo of yours for the first volume of the collective edition. if you have one at hand ; may I repeat the request without appearing to be obstrusive ?

The other day, my sister, who is teacher in an elementary school, told me a little incident which happened in her class. She sometimes in the morning reads some of your Gitanjali songs to her pupils, and when she read, "This is my prayer to Thee my lord." the children asked her to let them write it down in their copy books. So she gave it to them and some days after, when the girls were having their Quaker-meal and one of them broke her bowl, she swallowed her tears saying earnestly ; "Give me the strength to raise my mind high above daily trifles." And when my sister afterwards asked her, "So you know the psalm by heart ?" She said. "Oh yes, at night when I am in bed I always repeat it to myself." I know this little incident will make you glad and hopeful as it did me.

Please give my friendliest greetings to you dear son and daughter and Mr. Pearson and tell them how much I am looking forward to welcome you here and accept once more the assurance of my most ardent devotion.

Ever yours

Helene Meyer Frandt.

London, June 24th, 1920.

Dear master,

Let my words remind you of Russia, where the lovely poetical images which you evoke, bring beauty and solace to human life and your personality is surrounded by a halo of admiring respect. You bring into contemporary life that lofty spiritual joy, which gives strength to the seekers of a radiant future.

Please accept the heartfelt greetings of a Russian artist.

Your very sincerely

N. Roerich.

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯
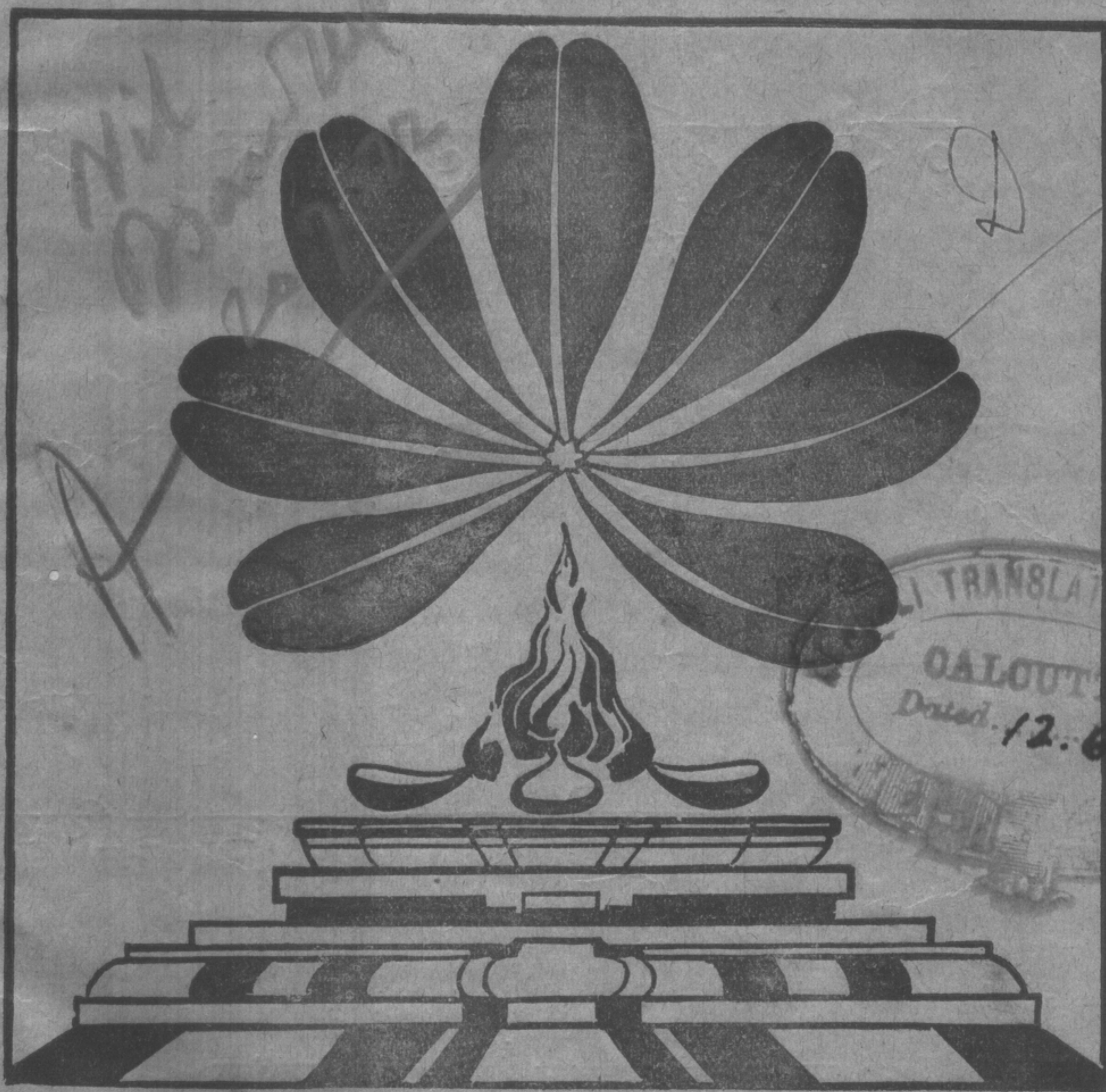
শান্তিনিকেতন

তৃতীয় বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা

সম্পাদক
শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

বার্ষিক মুল্য
ডাক মাশুল সহ ১॥০ টাকা
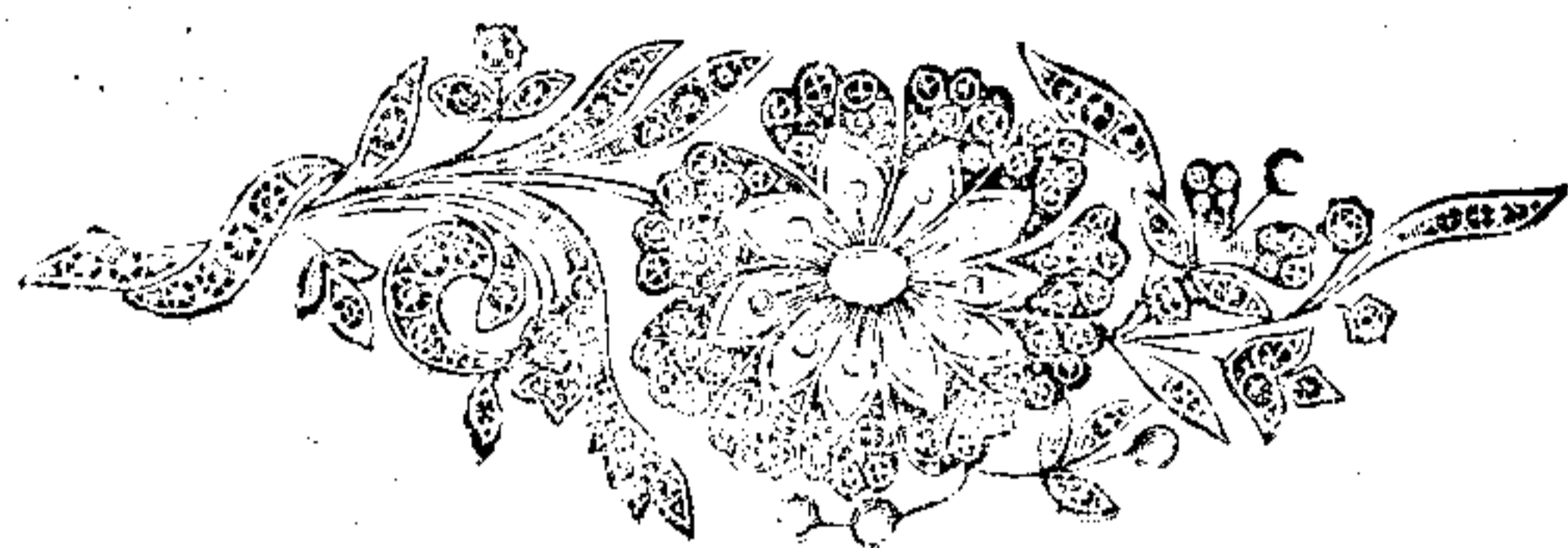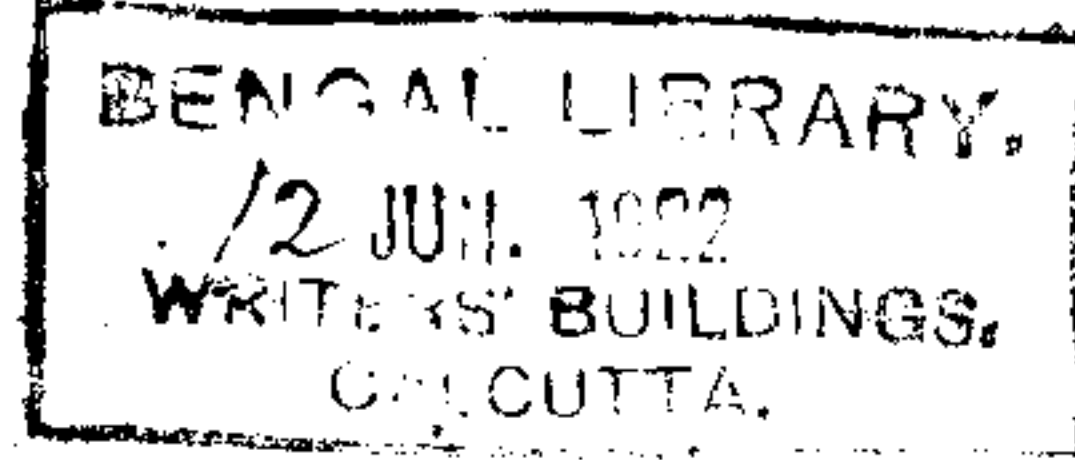
শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"।

৩য় বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, সন ১৩২৯ সাল। | ৫ম সংখ্যা

নববর্ষ

(১লা বৈশাখ ১৩২৯, মন্দিরের উপদেশ)

আজ আমাদের নববর্ষের উৎসবের দিন। যিনি চিরনবীন তিনি গ্রহতারালোকিত মহারথে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, চির-জীবনের পথে সংসারকে নিয়ত বহন করে নিয়ে চলেছেন। আজ আমরা সেই অমৃতস্বরূপের আশীর্ব্বাদ অন্তরে গ্রহণ করে জীবনকে মৃতসঞ্জিবনীরসে অভিষিক্ত করব।

আমরা আজ বাইরের জগতের দিকে চেয়ে নূতনের উৎসবকে দেখতে পাচ্ছি। প্রকৃতিতে পুনঃ পুনঃ নূতনের আবর্ত্তন হচ্ছে। পৃথিবী যেখান থেকে সূর্য্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ সুরু করেছিল আজ বৎসরান্তে সেখান থেকেই আবার তার যাত্রার আরম্ভ হল। এই আবর্ত্তনের মধ্যে বিচ্ছেদ নেই। যে সব ফুল গত বৈশাখে ফুটেছিল আজ আবার সেই চাঁপা-বেল-জুঁই, নূতন ঋতুতে নব আনন্দের সরসতায় আবির্ভূত হল। তাদের ক্লান্তি নেই, অবসাদ হয় না, তারা বিনষ্ট হয় নি; তারা মহাপ্রাণের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত ছিল, তাই আবার ফিরে এল। তাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ্বের ললাটে জরার বলীরেখা নেই—আজ চারিদিকে শুনতে পাচ্ছি নূতনের জয়ধ্বনি।

কিন্তু মানুষের জীবনে নবীনতার অর্থ আরো গভীর। পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তার জীবনলীলার পরিচয় নয়। আমরা বাইরের বিশ্বে চেয়ে দেখি, গাছের মধ্যে তার প্রকাশ একটা পূর্ণতায় এসে ঠেকেছে, তাই সে ক্রমাগত একই ফুলকে জন্ম দিচ্ছে ফোটাচ্ছে, একই ফলকে ফলাচ্ছে। এর চেয়ে বেশী তার কাছে দাবী নেই। কিন্তু মানুষের প্রাণপুরুষের বিশ্রাম নেই, সে তার গন্তব্যে এসে পৌছায়নি। সে যে অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবতাকে পূজা করবে তার আয়োজন এখনও বাকী আছে, তার উপকরণ এখনো সংগ্রহ হয়নি, তার রচনা এখনো অসমাপ্ত। যদি তার আত্মপ্রকাশ কোনো একটা ক্ষুদ্র সীমায় এসে পূর্ণ হতে পারত, তবে প্রকৃতিতে আজকার গাছপালার উৎসবের মতই তার উৎসব এমনি সুন্দর হতে পারত—তার ফুলের সাজি তার ফলের ডালি এমনি সহজে ভরে উঠ্‌ত। সে বলত, "আমার উদ্যোগ সারা হয়ে গেছে—এখন থেকে

শতাব্দীর পর শতাব্দী একই চক্রপথে বিনা চিন্তায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে প্রবৃত্ত থাকব।" কিন্তু আমাদের অন্তর যে তাতে সায় দেয় না, আমরা ত কিছুতেই বলতে পারি না একটা জায়গায় এসে ঠেকে গিয়েছি। আমাদের মন বলে, "জীবন বীণার সব তার এখনো চড়ানো হয়নি, সব সুর এখনো সাধা হল না। আমাকে যে দেয়ালি উৎসব করতে হবে; একটা একটা বাতিতে ত আমার কুলাবে না; দিকে দিকে মহলে মহলে যে আমাকে অন্ধকার দূর করতে হবে।" তাই আমরা যে নবীনতার সাধনা করব সে ত পুনরাবৃত্তির দ্বারা নয়, সে অসীমের আবরণ উদ্‌ঘাটনের দ্বারা। তাইত আমাদের উদ্যোগের আর বিরাম নেই। মানবের অন্তরে যে তপস্যার হোমাগ্নি জলেছে তাতে নিয়তই আহুতি দিতে হবে, বেদনা দাহনের শান্তি নেই। তাই আমাদের নববর্ষের উৎসব হচ্ছে তপস্যার হোমহুতাশনে নূতন আহুতি দান।

তবে আজ বর্ষারম্ভের দিনের প্রভাতে এই যে শান্তি এই যে সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির কর্ম্মের অভ্যন্তরে এই যে গভীর বিরাম এর সঙ্গে আমাদের যোগ কোথায়? আছে যোগ। চারিদিকের প্রকৃতিতে আমরা পূর্ণতার যে রস পাচ্চি এর থেকে সরল ভাষায় আমরা অসীমের একটা পরিচয় পাই। সেটি যদি না পেতুম তাহলে আমাদের চিত্ত পরিপূর্ণতার সাধনায় আস্থা লাভ করতে পারত না। তানপুরার চারটি তারে চারটি মূল সুর বাঁধা সারা হয়েচে সেই মূল সুর কয়টি কানের কাছে বার বার ফিরে ফিরে আস্‌চে। সেই জন্যেই গানে আমাদের নতুন নতুন যে তান লাগাতে হবে সেই তানগুলি মূল সুরের বাঁধন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় না। আমাদের চারিদিকে গাছপালার মধ্যে অসীমের যে সহজ সুর রয়েচে, যে সুরের কেবলি প্রভাতে সন্ধ্যায় ঋতুতে ঋতুতে আবৃত্তি হচ্ছে, সেই-গুলি আমাদের সাধনাকে আনন্দ লোকের পথ নির্দ্দেশ করে আমাদের জীবন সঙ্গীতকে উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে নিরস্ত করে।

যা সহজে পেয়েচি এই আমার সমস্ত সম্পদ নয়, ত্যাগের দ্বারা তপস্যার দ্বারা আমাদের সম্পদকে নিত্যই নূতন করে আবিষ্কার করতে হবে। প্রভাত সূর্য্যের আলোক-অভিঘাত আমাদের দ্বারে এসে পৌঁচেচে, তার বাণী এই:—হে যাত্রী, এখানে নিদ্রা নয়, অবসাদের জড়তা নয়, গম্যস্থান এখনো বহু দূরে। কঠিন পথে চলতে হবে। মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে কণ্টকের উপর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। শ্যামল বসুন্ধরার অঞ্চলে যে মর্ত্ত্যালোকের তপস্বীরা তাদের আসন পেতেছে তাদের কাছে নববর্ষের এই বার্ত্তা এসেছে—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

মানুষ কি এই বাণী শুনতে পায়নি? সে যে ইতিহাসের আরম্ভ থেকেই এই বার্ত্তাকে মেনে নিয়েছে, তাই সে বেঁচে গেছে। সে বলেছে—"আমি থামব না, ক্ষুধা তৃষ্ণাকে মানব না, রোগ দুঃখের মূল উচ্ছিন্ন করব, অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করে নব নব জ্ঞান লাভ করব। সুদূর লক্ষ যোজন দূরে যে গ্রহনক্ষত্রে আলোর হৃৎস্পন্দন হচ্ছে তাদের নাড়ীর পরিচয় পাব,—যা প্রয়োজন, যা অপ্রয়োজন, সমস্ত বস্তুকেই জেনে নেব। মানুষ তাই যাত্রা করেছে, তার নিদ্রা নেই, আরাম নেই, সে জ্ঞানের, কর্ম্মের, বিত্তের তপস্যা করে চলেছে।

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে একদিন ভারতের ব্রহ্মবাদী গুরু বলেছিলেন, "অন্নং ব্রহ্ম।" অর্থাৎ এই অন্নময় স্থূল বস্তুজগতেও অসীমের প্রকাশ আছে। যারা অন্নময় জগতে অসীমের সাধনা করতে প্রবৃত্ত হয়েচে তারা কেবলই বস্তুর বাধাকে অতিক্রম করে করে শক্তি সম্পদের অসীমতার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেচে। অন্নজগতের অসীমের তাপসদের কাছে অন্নজগতের ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার তার নতুন নতুন মহল কেবলি উদ্‌ঘাটিত করে দিচ্চে। তারা বলেনি আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ অতএব আমাদের আকাঙ্খাকেও সীমাবদ্ধ করতে হবে। তারা কোনো বিঘ্নকে কপালের লিখন বলে স্বীকার করে নেয়নি। তাদের ললাটে যে অনন্তের জয়তিলক আঁকা রয়েছে, কোথাও তাদের অধিকারের শেষ নেই, এই কথা মেনে তারা কোনো দারিদ্র্যকে কোনো রোগতাপকে চরম বলে, বিধি নির্দ্দিষ্ট বলে গ্রহণ করে নি। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি আধিব্যাধিকে ভাগ্যদোষের দোহাই দিয়ে শিরোধার্য্য করে

নিলে তাতে মনুষ্যত্বকে অস্বীকার করা হল, কারণ বিধাতা যে মানুষকে বলেছেন, 'তুমি মৃত্যু দণ্ডকে এত সহজ মেনে নেবে না, তোমাকে সকল আঘাতের উপর অভাবের উপর জয়ী হতে হবে।'

তাই আজ পশ্চিম মহাদেশে মানুষ কেবল মাত্র রোগের চিকিৎসার কথা ভাবচে না, সে রোগের গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাতে চেয়েচে। তারা শুধু বড়ি পাঁচনের কথা ভাবে নি তারা বলুচে রোগের যেখানে উৎপত্তি সেইখানে গিয়ে তাদের আক্রমণ করব। দূরত্বের ব্যবধানকে তারা সীমা পিঞ্জরবদ্ধ জীবের অবশ্যস্বীকার্য্য বলে গ্রহণ করে নি। একদা মানুষ নিজের দুই খানি পা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল—কিন্তু তার মনের ভিতরে এই মন্ত্রটি আছে যে, অন্নং ব্রহ্ম, সেই জন্যই অন্য জন্তুর মত কেবল মাত্র বিধিদত্ত নিজের পায়ের উপরেই সে ভর করে দাঁড়াল না। গোরুকে হাতিকে ঘোড়াকে উটকে নিজের বাহন করে নিজের পদবৃদ্ধি করে চল্‌ল। তাতেও থাম্‌ল না, বাষ্পকে তড়িৎকে লাগাম দিয়ে বাঁধল,—স্থলে জলে জলতলে আকাশে কোথাও সে অসাধ্যকে স্বীকার করলে না, অন্নজগতে অসীমকে নিরন্তর লাভ করতে লাগ্‌ল।

কিন্তু অপরদিকে আমাদের একথা মনে হতে পারে যে মানুষ তো নানা তপস্যার দ্বারা অন্নজগতের ঐশ্বর্য্যকে লাভ করতে থাক্‌ল কিন্তু তাতে হল কি? এর ফলে কি ধনী নির্ধনকে কষ্ট দিচ্ছে না, শক্তিমান্ দুর্ব্বলকে আঘাত করছে না? পৃথিবী কি কলকারখানায় কণ্টকিত কলুষিত হয়ে উঠচে না, যন্ত্র কি মানুষের লোভের বাহন ক্রোধের বাহন হয়ে মানুষকে দেশে দেশে দলিত করচে না? তা তো করচে। তার কারণ, অন্নই ব্রহ্ম এই কথাটা তো সম্পূর্ণ সত্য নয়। শিষ্যের প্রশ্নের শেষ উত্তরটাকেও আমাদের জানতে হবে—সে হচ্ছে, আনন্দই ব্রহ্ম। সেই আনন্দ লোকের ব্রাহ্মকে সাধনা করতে হলে তারো ত কোথাও সীমা মানলে চলবে না। এই সাধনার বাধা যে আমাদের রিপু। সেই রিপুর সঙ্গে রফা নিষ্পত্তি করে তাকে অল্পস্বল্প ঠেকিয়ে রাখাই ত আমাদের তপস্যা নয়,—তার সম্বন্ধেও অসাধ্য সাধন করতে হবে—তাকে সমূলে বিনাশ করা যায় এই শ্রদ্ধা মনে রাখতে হবে—সেই শ্রদ্ধার অসীমতাকে মেনে নিয়ে ফলের অসীমতাকে পাবার সাধনা করতে হবে।

আনন্দ ব্রহ্মের সাধনা কি অন্নব্রহ্মের সাধনাকে অ-স্বীকার করে তবেই সম্ভবপর হয়? সত্যের এক দিককে বাদ দিলেই কি সত্যের অন্যদিককে লাভ করা যায়? অন্নলোকের ব্রহ্ম এবং আনন্দলোকের ব্রহ্ম এই উভয়কে একত্র করে জানলে তবেই কি মানুষ পরিপূর্ণ সত্যকে লাভ করে না? এবং সত্যের এই পরিপূর্ণতা ছাড়া আর কিছুতেই কি বাঁচাতে পারে? ভারতবর্ষ অনন্তকে আনন্দ লোকেই উপলব্ধি করতে চেয়েচে, তাতে অন্নলোকে তার পরাভব ঘটেচে, সে আজ রোগে দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে মরতে বসেছে। য়ুরোপ অনন্ত অন্নলোকে সাধন করতে প্রবৃত্ত,—জলে স্থলে আকাশে তার অধিকার বিস্তৃত হচ্ছে—বিশ্বের শক্তিরূপকে প্রতিদিনই সে বিরাটতর করে জানতে পারচে। এমন কিছু আশ্চর্য্য নয় যে একদিন আমরা খবরের কাগজ খুলেই জানতে পারব যে পশ্চিমের মনীষীদের সাধনার ফলে পরমাণুর মধ্যে যে বন্দিনী শক্তি ছিল সে কারামুক্ত হয়ে মানুষের তপস্যার সহচরী হল। কিন্তু বস্তুবিশ্বকে জয় করবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরের দুঃখ তো ঘুচল না, শান্তি লাভ তো হল না। আধিভৌতিক জগতে বাইরের বাধাকে অপসারিত করে মানুষ যেমন বস্তু-বাধা থেকে মুক্তিসুখ অনুভব করছে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে অন্তরের বাধাকে দূর করে দিয়ে ব্রহ্মের আনন্দরূপ উপলব্ধি করতে হবে, তবেই ত সকল মানসিক অশান্তির ও অবসাদের অবসান হতে পারবে। আমাদের তখনই যথার্থ ব্রতের পারণ দিন আসবে যে দিন বাহিরে অন্নের ভাণ্ডার ও অন্তরে আনন্দের ভাণ্ডার মুক্ত হয়ে, ব্রহ্মের বাহ্য অন্তর দুইস্বরূপকে পূর্ণ করে দেখাবে।

সমস্ত মানবের যজ্ঞকে আমরা যদি আজ এক ক্ষেত্রে দেখি তা হলে জানতে পারব যে, এই এক যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ

অংশের নির্ব্বাহ ভার বিশেষ ভাবে এক এক জাতির উপর রয়েচে। সেই অংশগুলিকে যতক্ষণ আমরা মিলিত করে না দেখতে পারি ততক্ষণ তার অসম্পূর্ণতা আমাদের আঘাত করে। কিন্তু যখন তাদের আমরা সজ্ঞানে মিলিয়ে দেখি তখন আমাদের অগৌরব দূরে যায়। আনন্দই ব্রহ্ম এই মন্ত্রই যদি ভারতের সাধন মন্ত্র সত্য হয় তাহলে পৃথিবীতে এই অমৃতরসের পরিবেষণ ভার কি ভারতবর্ষকে নিতে হবে না? আলোক শিখার পরিচয় এই, যে তার দীপ্তি তার প্রদীপকে ছাড়িয়ে চলে যায়, তেমনি অমৃতের পরিচয় এই যে, সে তার আপন আধারের মধ্যে কিছুতেই বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। ভারতবর্ষ অমৃতের অধিকারী এই গর্ব্বোক্তি যদি সত্য হয় তবে এই অধিকারকে সমস্ত মানুষের অধিকার করে তোলবার চেষ্টাতেই সেই গর্ব্ব সার্থক হবে।

বুদ্ধদেব যখন তপস্যার ক্লান্ত, তখন সুজাতা পায়সান্ন প্রস্তুত করে তাঁর ক্লান্তি দূর করেছিলেন। আজ পশ্চিমের তাপসদের আত্মার ক্ষুধা মেটাবার অন্ন কি আমরা সংগ্রহ করেচি? তাদের তপস্যাও যে আমাদের তপস্যা। পশ্চিমের সাধনাকে আমার বলে স্বীকার করব না—একথা বলবার মত মনুষ্যত্বের এত বড় অবমাননা আর নেই। আমাদের দিক থেকে তাকে পূর্ণ করে তুলতে হবে এই কথাই আমাদের বলবার কথা। পশ্চিম তার অন্নব্রহ্মের সাধনায় অভাবনীয় শক্তির অধিকারী হয়ে উঠ্‌চে—আমরা আনন্দ ব্রহ্মের সাধনা যদি নিষ্ঠাপূর্ব্বক করি, রিপুর বাধাগুলিকে যদি মূল ঘেঁসে উচ্ছেদ করতে পারি তাহলে আধ্যাত্মলোকে মানুষের জন্যে যে পরমাশ্চর্য্য সম্পদের উদ্‌ঘাটন হতে পারে কোনো খানেই তার সীমা নেই। কেন না ব্রহ্মের "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ"—জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার স্বাভাবিকতাই হচ্ছে অনন্ত স্বরূপের ধর্ম্ম—বাহ্য প্রকৃতিতে যেমন অনন্তের সাধনায় এই জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম্মের স্বাভাবিক উৎসকে সন্ধান ক'রে বাহির করা হচ্চে, আমাদের অন্তর প্রকৃতিতেও তেমনি ব্রহ্মের সাধনায় এই জ্ঞান, শক্তি ও কর্ম্মের স্বাভাবিক উৎসকে সন্ধান করে পাওয়া যায়। রিপুর আক্রমণে ও আবরণেই এই স্বাভাবিকতাকে নষ্ট করে, তখন আমাদের কর্ম্ম ভয় ক্রোধ লোভের উত্তেজনাতেই কৃত হয়, সুতরাং সেই কর্ম্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে প্রকাশ করি না—সেই কর্ম্মের মধ্যে চিরদাসত্বের গ্লানি—সেই কর্ম্ম কিছুতেই আমাদের আনন্দের মধ্যে নিয়ে যায় না। যতই না নিয়ে যায় ততই বিরোধ বিদ্বেষ অশান্তি। তাই উপনিষৎ বলেচেন, "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্‌," আনন্দ যদি ভোগ করতে চাও তবে ত্যাগ কর, লোভ কোরো না।

হে ভারতবর্ষের তপস্বী, অন্তরকে পবিত্র কর, অমৃতমন্ত্রে দীক্ষিত হও। "ভূমৈব সুখং" এই সত্যকে গ্রহণ কর। সেই ভূমা সকল দেশকে গ্রহণ করে' সকল দেশকে অতিক্রম করে' সকল মানুষের ইতিহাসকে অধিকার করে বিরাজ করেন। "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ"—তিনি বিশ্বের আদি অন্তে পরিব্যাপ্ত, "সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু"—তিনি শুভবুদ্ধিদ্বারা আমাদের সকলকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বলাকা"

(ব্যাখ্যা ও আলোচনা)

(বিশ্বভারতীর সাহিত্যক্লাসে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যাপনার সময়ে গৃহীত নোট হইতে)

ভূমিকা

এই কবিতাগুলি প্রথমে "সবুজপত্রে"র তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে ৪।৫ টি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখে ছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙ্গাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে

ছিলেন, তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিক ভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে "বলাকা" বলা হয়েছে। হংস শ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্ব্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।

বলাকা (১)

এই কবিতার মূলগত ভাবটি এই—যৌবনের যে একটি প্রবলতা সে সমস্তকে ভেঙ্গে পরখ করে প্রত্যক্ষ করে দেখতে চায়। শাস্ত্র বাক্য আপ্তবাক্য এ সব তার জন্য নয়। প্রবীনতা চায় যে কোনো মতে পরের অভিজ্ঞতার বলে বিঘ্ন ব্যথাকে এড়িয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তারা আবার তাদের প্রবীনতার বোঝা চাপিয়ে দেবে। বাঁধা বুলি না মেনে প্রত্যক্ষের দ্বারা সব কিছু অনুভব করার মধ্যে বেদনা আছে। কারণ তাতে পরের অভিজ্ঞতার কর্ণধারত্ব নেই এবং বাঁধাপথের নির্বিঘ্নতাও নেই—কিন্তু এই তো যৌবনের ধর্ম্ম।

যৌবনই বিশ্বের ধর্ম্ম, জরাটা মিথ্যা। যৌবন জরাসন্ধের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলে জীবনের জয়ধ্বজা উড়ায়।

এই কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লিখিত।

বলাকা (২)

"সর্ব্বনেশে" একটি রূপক বা Symbol নয়। অন্তরে বা বাহিরে যদি সর্ব্বনেশে আসে তবে তার কেমনতর অভ্যর্থনা হবে? গ্রহণ না পলায়ন? এটাই চিন্তনীয় ছিল। দুঃখ-কালেই অন্তরের ও সমাজের প্রচ্ছন্ন সম্পদ দেখা দেয়। দুঃখের দিন ছাড়া অপ্রত্যক্ষ অন্তর সম্পদ আপনাকে প্রকাশ করে না। গত যুদ্ধকালে কত অখ্যাতনামা হীন দীন জন নিজেকে প্রত্যক্ষ করিয়েছে এবং নিজের স্বরূপকে প্রকাশিত করেছে।

(৩য় শ্লোক) জ্ঞাত বস্তুর অভ্যাস অজ্ঞাতের ডাককে বাধা দেয়। আজ দুঃখের মরণের আহ্বানে নিরুদ্দেশের আহ্বানে জ্ঞাতঅভ্যাসের মূলচ্ছেদ হল। অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় (মূল)কেই "ভিত্" বলা হয়েছে। ব্যক্তির ও মানবের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এরূপ আহ্বানের যুগ আছে। তখন বাহির ও ঘরের বিরোধ বাধে।

(৫ম শ্লোক) তরুণী যেমন পিতার ঘর ছেড়ে পতিগৃহে গিয়ে নিজ যৌবনের সার্থকতা লাভ করে তেমনি আজ আমার অন্তরাত্মাকে পরিচিত ভূমি ছেড়ে অজানার দিকে আনন্দ যাত্রা করতে হবে। এতে দুঃখ আছে, তবু এ সর্ব্বনাশ নয়, কারণ এ পতিগৃহে যাত্রার মত।

[আলোচনা। ইয়োরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্ত্তা এই কবিতা লেখবার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে যেন এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসান প্রায়। মৃত্যু দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল। আমার যেন একটা নূতন অভিযান, adventure আরম্ভ হবে। হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন করে সর্ব্বনেশের জন্য অর্ঘ্য রচনা করতে হবে। কেবল মতামত নয়, প্রাচীন মতামত সংস্কার প্রভৃতি যা কিছু প্রিয় সব পিতৃগৃহের মত ত্যাগ করে নব রক্তপট্টাম্বরে পতিকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ সর্ব্বনাশের যে যুগসন্ধিক্ষণ এসেছে।]

বলাকা (৩)

৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩২৮

"আমরা চলি সমুখ পানে"—

এই কবিতায় আমার আগের দুটি কবিতার ধারাটিই চলে এসেছে। 'বলাকার' প্রথম কবিতাতে এই ভাবটিই ছিল—যৌবনের জয়ধ্বনির কথা, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পূর্ব্ব-

যুগের গণ্ডী ভেঙে ফেলে মুক্তি লাভ করে নূতন করে জীবনকে গড়ে তোলার কথা।

প্রতিযুগের যুবাদের উপর এই ভারটি রয়েছে, তারাই প্রলয়ের ভিতর দিয়ে চিরন্তন সত্যের নূতন পরিচয়কে লাভ করবে। এবারকার যে নবযুগের কথা বলা হয়েছে, এযুগ সকল মানুষকে নিয়ে। মানুষকে যে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন করে রাখে সেই অন্ধকার রাত্রি অবসান প্রায় আর নবযুগের প্রভাত আসন্ন একথা আমার মনে হয়েছিল, সেই ভাবের আবেগে এই কবিতাগুলি লেখা। মনে হতে পারে বুঝি লাইন মিলিয়ে কতকগুলি কবিতা লেখবার উদ্যোগেই এগুলি লেখা হয়েছে, কিন্তু তা নয় আমার ভিতরে একটা তাগিদ এসেছিল তারই প্রেরণায় এগুলি রচিত হয়। অনেক সময়ে কোনো কোনো রচনাকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখের প্রকাশ বলে আপাতত মনে হয়, পরে দেখা যায় তা ঠিক নয়। ভিতরে ভিতরে একটা বিশ্বব্যাপী সত্যের তাগিদ নানা ছলে নিজেকে প্রকাশের উপলক্ষ্য খোঁজে। নিজের জীবনের যে ঘটনাগুলি নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অঙ্গীভূত সে-গুলোকে উপকরণরূপে ব্যবহার করে' মনের কোন্ একটা নিগূঢ় অনুভূতি নিজেকে ব্যক্ত করে।

"অন্তর্য্যামী" কবিতাতেও সেই কথাই বলেছি। তাতে লিখেছি যে, হাটে যাবার সঙ্কল্প করে রাস্তায় বেরিয়েছিলুম, শেষে দেখি নিজের অগোচরে সেই সঙ্কল্প কোন্ এক অজানার মধ্যে যাবার উপলক্ষ্য হয়ে উঠ্‌ল। এযেন তার-হীন টেলিগ্রাফযন্ত্রে কান পেতে আছি ঘরের খবর পাবার জন্যে—হঠাৎ দেখি সেই ঘরের খবরকে ছাপিয়ে দিয়ে একটা আকাশের বার্ত্তা এসে হাজির। বলাকার এই কবিতাগুলিকে সেই রকম কোন একটা উড়ো পথে কবির মনে পৃথিবীর কোন্ একটা গভীর বেদনার বার্ত্তা বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(কবিতা পাঠ)

—এই কবিতায় ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের কথা নেই কিন্তু এতে সমস্ত মানুষের সাধনার কথা বলা হয়েছে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে অমৃতকে সন্ধান করবার জন্য পৃথিবী জুড়ে প্রলয় ব্যাপার চলছে। একদল গতযুগের আইডিয়ালকে আঁকড়ে ধরে, তাকেই বিশ্বাস করে পড়ে আছে। তারা পুরাকালকে আশ্রয় করেছে বলে যে তাদের বিপদ নেই তা নয়, ভাবী কালকে বাধা দিতে গিয়ে তাদেরও লড়তে হয়। কার্য্যতঃ কিছু না করলেও তারাই বেশী লড়াই করে। তাই আজ যারা পূর্ব্বকার ন্যাশানালিজিমের ভাবকে আঁকড়ে রয়েছে তারাও ঘরছাড়া, তাদের আশ্রয় নেই। তারা স্বাজাত্যের অপদেবতার মন্দিরটাকে রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। পূর্ব্বতন ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষ মানুষকে কম দুঃখ দেয় না। এই একটি দল ছাড়া আর এক দল আছে যারা নবযুগের বাণী বহন করছে। তারা ঘরছাড়ার দল। নৈরাশ্যের তাড়নায় তারা বার হয় নি। আলোকের পথে তাদের অভিযান, বাধা বন্ধ ছিন্ন করে নূতন যুগের অভিমুখে তাদের অভিসার যাত্রা। সেই যাত্রার মুখে তাদের বিঘ্ন বিপদ রক্তপাত সহ্য করতে হয়েছে।

যারা তামসিকতায় জড়িত হয়ে পূর্ব্বের সংস্কারকে বিশ্বাস করছে তারা ভুলে যায় যে অনেক আগে তাদেরও এই ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়ে একটা স্থিতির মধ্যে আসতে হয়েছে। তারা মনে করে যে তারা সত্যের চরম সীমায় এসে পৌঁছেচে, এই চিরকেলে পথেই মঙ্গল হবে, তাই অন্যকে তারা বাধা দেয়। একটি ভৌগোলিক উপদেবতার কাছে তারা নরবলি দিয়েছে, তারা মানুষের নারায়ণকে অবজ্ঞা করছে। এই স্বাজাত্যাভিমানীদের সঙ্গে নবযুগের দলের বিরোধ চলছে। যারা উদার ও সর্ব্বজনীন আইডি-য়ালকে বিশ্বাস করে তারা আজ দুঃখ পাচ্ছে, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করছে। কিন্তু তাদের এই নিন্দা দুঃখ অপ-মানের ভিতর দিয়ে আপন বিশ্বাসকে অবিচলিত রেখে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

এই ভাবটিই আমার মগ্নচৈতন্যের মধ্যে এসেছিল এবং আমার এই কবিতায় তা প্রকাশ করতে চেয়েছি। দেশের যে

গণ্ডীর ভিতরে আশ্রয় লাভ করে আমরা তাকে ঘর মনে করেছিলাম, সেই সীমারেখা ত্যাগ করে যারা ঘরছাড়া হয়েছে তারাই ভবিষ্যতের মহা যুগের যাত্রী ; সম্মুখের বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে তাদের অগ্রসর হতে হবে।

বলাকা (৪)

"তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে"—

মানুষকে মিলিত করবার নবযুগকে আহ্বান করবার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধূলায় পড়ে রয়েছে। এ'কে গ্রহণ করবার মধ্যে অনেক দুঃখ আছে।

ব্যক্তিগত যে কথাটুকু এই কবিতার মধ্যে আছে, তাকে ছাড়িয়ে আমি যে ভাবটা প্রকাশ করতে চেয়েছি তা এই ;— একটা সময় এসেছিল যখন বেদনার আঘাতে মনে হয়েছিল, জীবনের কাজ তো সারা হয়ে গেছে, এখন পূজা অর্চ্চনার দ্বারা শান্তি পাবার সময় এসেছে এখন অন্য কোনো কাজের দাবী নেই। সে সময়ে এই পূজাকেই তখনকার একমাত্র কর্ত্তব্য বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে একটা দাবী এল, হঠাৎ মনে হল মানুষকে আহ্বান করবার শঙ্খ ত বাজাতে হবে, বিশ্ববিধাতার নামে মানুষকে ছোট গণ্ডী থেকে বড় রাস্তায় ত ডাকতে হবে। এখন বললে চলবে না যে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাই। আমার আরত্রিক পূজার কি সময় আছে? তবে কি জীবনের সন্ধ্যায় রজনীগন্ধার শুভ্র স্নিগ্ধ বিকাশ হবে না তবে কি এখন রক্তজবার মালা চাই? মনে করলেম বুঝি জীবনের শেষ বোঝাপড়া এবার করে নিতে হবে, কিন্তু নীরব শঙ্খ আমায় ইঙ্গিত করলে মানুষকে কোন বিরাট যজ্ঞে ডাক দিবার জন্য তাকে ধ্বনিত করতে হবে!

এই কবিতা যে সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ সুরু হতে দুমাস বাকী আছে। তার পর শঙ্খ বেজে উঠেছে ;— ঔদ্ধত্যে হউক, ভয়ে হউক নির্ভয়ে হউক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌছবার সিংহদ্বার স্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্ব্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষে হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব এখনো আরম্ভ হয় নি। আরো ভাঙ্গবে, সঙ্কীর্ণ বেড়া ভেঙ্গে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনো পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে, তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে কাল সর্ব্বজাতির লোকের। চাক ভাঙ্গা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌচেছে। রোমারোলাঁ, বাট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সার্ব্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েচে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে, প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই! পাখীর দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায় এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

আমি কিছু দিন থেকে এই কথাই ভাবছিলাম যে আমাদের এই যুগ সমস্ত মানবের পক্ষে এক মহাযুগ, পৃথিবীতে এমন সন্ধিক্ষণ আর কখনো আসে নি। একটা ভাবী কাল আসছে যা মানুষকে আগে থাকতে ভিতরে ভিতরে ঘা দিচ্ছে। মন্থনে যেমন নবনী ভেসে ওঠে তেমনি বিশ্বের বিধাতার জগৎব্যাপী মন্থন ব্যাপারে সাধকেরা উঠে পড়েচেন। এই বিবাগীর দলের বেরিয়ে পড়ার প্রয়োজন ছিল। বিধাতা এমনি করে ঠেলা মেরে এদের বার করে দেন, এঁরা সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টন থেকে সরে গিয়ে মুক্তিলাভ করেন।

পুরাণের কাহিনীতে আছে যে দেবাসুরের মন্থনে যে অমৃত উঠেছিল, রাহুকেতু তা পাবার জন্য চেষ্টা করেছিল, অযোগ্যেরা অমৃতে ভাগ বসাতে চেয়েছিল, অমৃত চুরি করতে চেয়েছিল। প্রাচীন কালের সে লোভ এখনো রয়েছে, এখনো স্বার্থের ভোগে লাগাবার জন্য লুব্ধ মন অমৃতকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করবে। লীগ অফ্ নেশনে যে সার্ব্বজাতিক উদ্যোগ হচ্ছে, বিশ্বের রাহু কেতুরা

তার আইডিয়ালিজিমকে নিজের ভাগে নেবার জন্য বসে আছে। এমনি করে মহাযুদ্ধের সময়ে স্বার্থের জন্য যারা লড়েছিল তারা তাকে ধর্ম্মযুদ্ধের আখ্যা দিয়ে কথার ছলনা করেছিল। বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা যখন ভঙ্গ করা হল তখন যেমন যুবকের দল তাকে রক্ষা করতে অস্ত্রধারণ করেছিল, তেমনি বুড়ো রাষ্ট্রনীতিকের দল স্বার্থ সাধনের হিসাব কষে এতে যোগ দান করেছিল।

যে বিশ্বব্যাপী প্রলয় মানবের চিত্ত সাগরকে মথিত করেছে তাতে এই দুই বিরুদ্ধ দলের উদ্ভব হয়েছে। অমৃত গরল দুই ই উত্থিত হচ্ছে। এই বিষ মানুষের বড় পাপকে বৃহৎ আকারে দেখিয়ে দেবে। দেবতাদের ভোগের অমৃত নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে, স্বাজাত্যের স্বার্থকে বাড়াবার জন্য চেষ্টা হবে কিন্তু শেষে অসুরের দলই পরাজিত হবে, জয় হবে দেবতাদের, আর শিব আসবেন সমস্ত হলাহল নিঃশেষিত করতে।

আমাদের অনুভব করতে হবে যে বিধাতা ছোট জায়গার মধ্যে কাজ করেন না। একটা বিরাট বিশ্বব্যাপার চলছে, পৃথিবী জুড়ে দৈত্যাসুরে মন্থন চলছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষের আমরা কোন্ দিক ধরি? দেবতাদের দিক না দৈত্যের দিক? কিন্তু যে পক্ষেই ধরি তাতে কিছু আসে যায় না। দেবতা যারা তারাই মন্থন শেষে অমৃত পাবার অধিকারী হবে। যারা গৃধ্নু তার বশে লালায়িত হয়ে ভোগ করবার জন্য ছুটবে তাদের ভাগ্যে অমৃত নেই।

কবি নিজের কবিতা যখন ব্যাখ্যা করে তখন তার কথা-রই যে প্রমাণ্য আছে তা নয়, কবিতা লেখা হয়ে গেলে সে অন্য পাঠকদের সমশ্রেণীয়। সে কেবল তার হৃদয়াবেগের ইতিহাসটার কথা বলতে পারে, কারণ রচনাকালের সমস্ত আনুষঙ্গিকতার সেই সব চেয়ে বড় সাক্ষী। কিন্তু কবিতার মর্ম্মগত অর্থ অপরেরও আবিষ্কার করবার ও ব্যাখ্যা করবার অধিকার আছে।

"বলাকা"-রচনাকালে যে ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করে-ছিল এখনো সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্য্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। বুকের মাঝে যে আলোড়ন হ'ল তার কি সার্ব্বজাতিক অভিপ্রায় আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে সে চিন্তা আমার মনে বর্ত্তমান ছিল। আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি, একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি, সে ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানেনি। "বলাকায়" আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছু দিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজা স্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

আলোচনা

গ্রহণ

জাপান একদিন ইউরোপকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল বলেছিল, আমরা তোমাদের জমি দেবনা, ঘরবাড়ী করতে দেবনা, আমাদের দেশে নামতে দেবনা তোমাদের আমরা চাই না! কিন্তু 'চাইনা' বললে কি হয়, 'কমলি নেহি ছোড়তি হায়!' এই মস্ত ভুল জাপান যেদিন উপলব্ধি করে-ছিল সেদিন তাকে বলতে হয়েছিল, হাঁ, তোমাদেরই আমরা চাই। তখন তারা যে বিদ্যায় ইউরোপ সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেছে সেই বিদ্যা গ্রহণ করেছিল।

আজ প্রাচ্য মহাদেশে যে কোনো দেশ যুরোপের বিদ্যাকে যে পরিমাণে অগ্রাহ্য করচে তারা সেই পরিমাণেই যুরোপের কাছে পরাভূত হচ্চে। বিদ্যা জিনিষের প্রতিষ্ঠা সত্যে, কোন দেশবিশেষে নয়—এবং বিশেষ সত্যের উৎপত্তি যে-দেশেই হোক্, তা সমস্ত দেশেরই সম্পত্তি। তাকে অস্বীকার করা

আর কিছু নয় সত্যের প্রতি নিজের অধিকারকে অঙ্গীকার করা।

য়ুরোপীয় বিদ্যা বাইরের জিনিস নয় এ কেবল সংবাদের সংগ্রহ বা পড়া মুখস্থ নয়।

এর মধ্যে একটি মনের সাধনা আছে—সেই সাধনায় মনের সঙ্গে বিশ্বের যে যোগ হয় সেই যোগে মন শক্তি পায়। বুদ্ধি মুক্তি লাভ করে। সত্যকে গ্রহণ সম্বন্ধে মনের সুর যদি ঠিকমত বাঁধা হয় তাহ'লে মন চরিতার্থতা লাভ করে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চ্চা কেবল জ্ঞান লাভ করা নয়, সে হচ্চে মনটাকেই তৈরি করা—মন তৈরি হলে মানুষ বিশ্বে জয়ী হয় নইলে পদে পদে তার পরাভব ঘটে।

যেমন আধ্যাত্মিক রাজ্যে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিল হ'লেই মুক্তি তেমনি আধিভৌতিক রাজ্যে বিশ্বের নিয়মের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির যে সামঞ্জস্য আছে সেটা লাভ হলেই আমাদের মুক্তি। আমাদের বুদ্ধি যখন নিজের অধিকারের মধ্যে বিশ্বকে পায় তখনই অশক্তি থেকে আতঙ্ক থেকে পরপরায়ণতা থেকে আমরা মুক্তি পাই।

মানুষের যেমন আত্মা আছে মানুষের তেমনি দেহমনও আছে, সেকথা ত উড়িয়ে দিলে চলবেনা। আত্মিক রাজ্যে আমরা অমৃতের অধিকার লাভ করব, কিন্তু সেই সঙ্গে আধিভৌতিক রাজ্যে আমরা মর্ত্ত্যলোকের অধিকার লাভ করব এই হচ্চে মানুষের সাধনার সম্পূর্ণতা।

ভগবান আমাদের মহা অধিকার দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, 'কারুর কাছে মাথা নীচু করবে না, আমার কাছেও না। সমস্ত বস্তু-বিশ্বকে তুমি আপনার হাতে নাও। আমার এই সম্পত্তি তোমারই রইল, তুমি একে চালাও।' তাঁর এই মহা অধিকারের দলিলকে আমাদের মানতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে। তিনি যদি আমাদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতেন তবে তো diarchy দ্বৈরাজ্য হ'ত, কিন্তু তিনি, কখনো তা করেন নি।

"যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ"

তিনি বিশ্বের সমস্ত অর্থের যে বিধান করেছেন, তা যথাতথ, সে বিধানে খামখেয়ালি নেই, তা নিত্যকালের। এতে সাত বছরের পরীক্ষার অপেক্ষা নেই। যে তা মেনেছে সেই ধনে ধান্যে বড় হয়েছে। এই নিত্যকালের সাধারণ বিধি কেউ আড়াল করে বসে নেই। পশ্চিম দেশের কোনো দানব এর উপর চেপে বসে নেই। পাশ্চাত্যবাসীদের তাড়াতে পারলেই সে বিধি করায়ত্ত হবে না, বিধাতার দলিল যেদিন স্বীকার করব এদের আপনা থেকেই চলে যেতে হবে, দাঁড়াবার আর যো থাকবে না। ভারত যখন বিশ্বসিংহাসনের কাছে দাঁড়িয়ে একযোগে বলতে পারবে, 'আমার বিশ্বরাজ্যে অধিকার আছে'—তখন কেউ তাকে আগলাবে না। কিন্তু যতদিন এই কথা বলবার শক্তি সঞ্চিত না হয়, ততদিন আমরা পরাভূত হব।

পাথরের খণ্ড সহস্র বৎসর ধরে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, সে কিছু নিতে পারে না। কিন্তু চিত্ত যেখানে সজাগ সেখানে তার প্রধান লক্ষণ এই যে তার গ্রহণ করবার শক্তি আছে কেবল বর্জ্জন করবার নয়। বাঙ্গলার ইতিহাসেও আমরা এটাই দেখেছি।

বাঙ্গলা পলিমাটির দেশ। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, তাই ধনে ধান্যে ভরে ওঠে। বাঙ্গলার চিত্তভূমিও সেইরকম উর্ব্বরা, উৎপাদনশীল। নানা বীজ এখানে পড়ে অঙ্কুরিত হয়। একথা কি আজ আমরা বলব না যে পাশ্চাত্যবিদ্যার বীজও এখানে পড়ে ফসল ফলাবে। আমাদের মাটিতে সব ফসলই ফলে এ কথা পৃথিবীতে সকল বড় জাতিই বলতে কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু যারা বর্ব্বর তারাই নেয় না। আফ্রিকার বর্ব্বরেরা কিছু নেয়ও না, দেয়ও না।

চীনের গোষ্ঠী প্রথা

কিছু কাল পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল চীনদেশের গভর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন, সম্প্রতি লণ্ডনের নেশন কাগজে চীনের গোষ্ঠীপ্রথার যে বিবরণ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের দেশের প্রথার সঙ্গে তার মিল দেখিয়া অবাক হইতে হয়। তিনি বলেন—

আমি যখন পেকিংএ ছিলাম সেই সময়ে এক সাধারণ বৃদ্ধ মহিলা মারা যান। তার অব্যবহিত পরেই তাঁর কন্যা মাতৃশোকে প্রাণত্যাগ করেন। পিতামাতার শোকে প্রাণ বিসর্জ্জন করা সেখানে একটা মস্ত গৌরবের বিষয়, যে ব্যক্তি এই রূপে মরে কেবল সে নয় তার কর্ম্মে সমস্ত গোষ্ঠী গৌরবান্বিত হয়। এইরূপ পিতৃভক্তির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সেখানে তোরণ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত আছে। যাই হোক্ উল্লিখিত ঘটনার পর সামাজের হুকুম হইল এমন মা ও মেয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন করিতে হইবে। তার খরচ মিটাইতে গিয়া মধ্যবিত্ত অবস্থার ছেলে কয়েকটিকে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রিকস কুলি হইতে হইল।

এই গোষ্ঠীপ্রথার প্রভাবে চীনের রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে সততার অভাব দেখা যায়, কোনো লোক যখন কোনো চাকরি পায় তখন তার গোষ্ঠীভক্তি বলে "তোমার চাকরির দৌলতে তোমার আত্মীয় স্বজনকে ধনী কর," তার মাহিনার দ্বারা এই লম্বা ফরমাস মেটে না। কাজেই তখন তাকে অসাধু উপায় অবলম্বন করিতে হয়। আর যদি সে তা না করে তাহা হইলে অযোগ্য ছেলে বা অযোগ্য ভাই বলিয়া সমাজে তার নিন্দা রটে। অনেক বিদেশ প্রত্যাগত চীন ছাত্র পশ্চিমের আদর্শ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল কিন্তু শেষে তাহারাও এই দেশব্যাপী কুপ্রথার জালে আটক পড়িয়াছে।

গোষ্ঠীপ্রথাকে খুব পাকা করিতে হইলে স্ত্রীলোকের দাসত্বকেও পাকা করিতে হয়। চীনে সে কাজটি বেশ ভালো করিয়াই হইয়াছে। প্রাচীন ধরনের চীনে মেয়ে স্বামীর নিকট-আত্মীয় ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সামনে বাহির হইতে পারেন না। তবে তাঁরা দাসী সঙ্গে লইয়া বাজার করিতে বা অন্য মেয়েদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন। বিবাহের পর স্ত্রী শ্বশুরের বাড়ীতেই বাস করেন এবং শাশুড়ির দাসীর স্থান অধিকার করেন। শাশুড়ি চাকর বাকরের মুখে বধুর যে কোনো কুৎসা শোনেন তাহাই বিশ্বাস করেন এবং তার অজুহাতে বধুকে আরো দাবাইয়া রাখেন। স্বামী দুশ্চরিত্র হইলে তাহাতে স্ত্রীর কোনো অভিযোগ থাকিতে পারে ইহা কেহ স্বীকার করে না কিন্তু স্ত্রী যদি স্বামীর মৃত্যুর পরেও আবার বিবাহ করে তাহা হইলে তার নিন্দা রটে। বিবাহের কথাবার্ত্তা বর কন্যার পিতামাতারাই ঠিকঠাক করেন, বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না। অনেক সময়ে শৈশবের বাগ্‌দান (betrothal) হইয়া থাকে। ইহা বিবাহের চেয়েও কড়া, কারণ কতকগুলি কারণে দম্পতির ছাড়াছাড়ির নিয়ম চীনে প্রচলিত আছে কিন্তু এই বাগ্‌দান ভঙ্গ করিবার কোনো নিয়ম নাই।

এ সমস্তই অবশ্য খুব খারাপ, নবীন চীন এর বিরুদ্ধে খুব জোরের সঙ্গেই বিদ্রোহ করিতেছে। এমন অনেক দম্পতির সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে যাঁহারা নিজেদের বাড়ীতেই আছেন, সেখানে স্ত্রীর স্বাধীনতা ইংরেজ স্ত্রীর চেয়ে কম নয়। অনেক মেয়ে আজকাল ইস্কুলে এবং কলেজে নতুন ধরণে শিক্ষিত হইতেছেন। পেকিং এর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাঁদের প্রবেশের কোনো বাধা নাই সেখানে আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেকগুলি মেয়ে আসিতেন, এই সব শিক্ষিত মেয়েরা স্বভাবতই প্রাচীন ধরণের বিবাহে বদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক। যে সব শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছে তাঁহারাও এ বিষয়ে মেয়েদের সঙ্গে এক মত।

পেকিং এ কয়েকটি অধ্যাপক ও ভাল ছেলেদের লইয়া অধ্যাপক রাসেল একটি আলোচনা-সমিতি গঠন করিয়া

ছিলেন, সেখানে প্রথমে কিছুকাল দর্শনের আলোচনার পর সামাজিক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। সামাজিক বিষয়েই ছেলেদের অনুরাগ বেশী ছিল। একদিন সংঘবাদ এবং বলশেভিকবাদ সম্বন্ধে খুব উত্তেজিত আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে অধিকাংশ ছেলেরা মত প্রকাশ করে যে কালই চীন সংঘবাদী (Communist) হইতে পারে আর তার সংঘবাদী হওয়াই উচিত; কিন্তু গোষ্ঠী প্রথার দিনই আলোচনা সব চেয়ে জমিয়া ছিল। এই উপলক্ষে রাসেল বলিতেছেন "পরে আমি জানিতে পারিলাম যে জ্ঞানের এবং নীতির রাজ্যের নবীন পথিক এই সমস্ত যুবকদের মধ্যে অনেকেই অপরিচিত প্রাচীন অন্ধসংস্কারে পূর্ণ মেয়েদের সঙ্গে বিবাহিত বা বাগ্‌দত্ত। ইহাতে যে কঠিন নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে তার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা বাহিরের লোকের পক্ষে শক্ত।"

চীন সমাজের যে চিত্র রাসেল আঁকিয়াছেন তাহার কালো দিকটার সঙ্গে হুবহু মিল আছে কিন্তু তার সাদা দিকটার সঙ্গে তেমন মিল আছে কি? নব্য চীন যেমন করিয়া প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে নব্য বাংলা তেমন করিতেছে কি? শিক্ষিত মেয়ে কি আমাদের সমাজে ডুমুর ফুলের মত দুর্লভ নয়? রাসেল যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা করিতে আসেন ত মেয়ে শ্রোতা বেশী হইবে কি? চীনের শিক্ষিত মেয়েদের মত আমাদের দেশের শিক্ষিতারাও হয়ত প্রাচীন ধরণের বিবাহ প্রথার বিরোধী কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকদের সম্বন্ধে নিশ্চয় সে কথা বলা যায় না কারণ যেপথে পিতা এবং পিতামহরা গেছেন তাঁহারা সেই বাঁধা রাস্তায় চোখ বুজিয়া চলিয়াছেন। রাসেল যদি কলিকাতায় তাঁর আলোচনা সমিতি স্থাপন করিতেন তাহা হইলে এ দেশের গোষ্ঠী প্রথার আলোচনার দিনই সব চেয়ে জমিত বটে কিন্তু ভোটে প্রাচীনের দলই বোধ হয় জিতিত। তার প্রমাণ মেয়েদের ভোটের অধিকার সম্বন্ধে বাংলার ব্যবস্থাপক সভার আর সিভিল বিবাহ সম্বন্ধে ভারত ব্যবস্থাপক সভার রায়।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আশ্রম সংবাদ

১। গত ১লা বৈশাখ নববর্ষের সূর্য্যোদয়ে মন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনান্তে শান্তিনিকেতনের তেতালার ছাদ ফলাহাররত ছোট বড়দের কলধ্বনিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল। রাত্রেও ভোজের ব্যবস্থা ছিল।

২। ২রা বৈশাখ শাল বীথিকার দুইপার্শ্বে ছেলেরা আনন্দবাজারের মেলা খুলিয়াছিল। বৈকালে দেখিতে দেখিতে কোন আলাউদ্দীনের প্রদীপের বলে ছেলেমেয়েদের কুড়িটী দোকান মহাসমারোহে ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিয়া দিল। ছেলেদের নিজেদের তৈয়ারী হালুয়া, গজা, সন্দেশ, লুচি, আলুর দম, "কাঁচালু", আচার, বিবিধ খেলনা, ছবি, বই, জামা, কাপড়, চা, মোরব্বা, প্রভৃতি কোন জিনিষের অভাবই বাজারে হইল না। বালকের দল দোকানে দোকানে গান গাহিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছিল, ক্ষুদে ঝাড়ুদার মুচি ভিক্ষুক প্রভৃতিও মেলায় অনেকগুলি দেখা গিয়াছিল। পূজনীয় গুরুদেব একটী কীটদষ্ট বেল একটাকা দিয়া খরিদ করায় ফলের বাজার অত্যন্ত চড়িয়া যায়। ইহার লভ্যাংশ দোকানদারগণ আশ্রম সম্মিলনীর তহবিলে দিয়াছে।

৩। গত ৫ই রাত্রে আশ্রম সম্মিলনীর পূর্ণিমা অধিবেশন উপলক্ষ্যে আশ্রমের ছেলেরা একটি যাত্রা অভিনয় করেন। শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ও প্রমথনাথ বিশী "বীরভূমেশ্বর পরাজয়" নামে একটী মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। গৌরপ্রাঙ্গনে আসর করিয়া সাজসজ্জা ঐক্যতানবাদন, ছোট বড় জুড়ীদের সঙ্গীত, যথারীতি হনুমান, মহাদেব, রামচন্দ্র, বীরমণি প্রভৃতির লোমহর্ষকর ভীষণ যুদ্ধ, প্রভৃতি সহ ইহার অভিনয় সুসম্পন্ন হয়। বিশ্বভারতীর ছাত্র শ্রীশচীন্দ্রনাথ কর—এই দলের অধিকারী ছিলেন। পূজনীয় গুরুদেব এবং দেশীয় বিদেশীয় অতিথি, অধ্যাপক নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী প্রভৃতি উপস্থিত দর্শকগণ এই অভিনয় দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন।

৪। আশ্রমের গ্রীষ্মাবকাশ ১৪ই বৈশাখ হইতে ১৪ই আষাঢ় পর্য্যন্ত হইয়াছে।

৫। ছুটীর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় শ্রীদ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্য একটী সোনার ঘড়ি দেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়া শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই ঘড়িটী পাইয়াছেন। শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

৬। Mr. Pearson অসুস্থতার জন্য ছয় মাসের বিদায় লইয়া কোঠগড়ে গিয়া বাস করিতেছেন।

৭। আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায় আশ্রমের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

৮। শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরীর স্থানে আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীরামদাস উকীল, প্রেসের ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন।

৯। গত ২৫শে বৈশাখ পূজনীয় গুরুদেবের দ্বিষষ্টিতম জন্মোৎসব আশ্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আশ্রমস্থ বালিকারা এই উপলক্ষ্যে তাঁহার বাড়ীর অলিন্দগুলি আলপনা মাল্য ও মঙ্গলঘট দিয়া খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়া ছিলেন। প্রাতে, "সবার মাঝারে তোমারে স্বীকার করিব হে" গানটি গাহিতে গাহিতে গুরুদেবের বাড়ীতে আশ্রমবাসিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মাল্য চন্দন দিয়া প্রণাম করিলে তিনি তাঁহার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং আশ্রমের সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলেন। ইহার পর প্রতিমাদেবী রথীবাবু ও মীরাদেবী সকলকে প্রচুর পরিমাণে জলযোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত করেন। মধ্যাহ্নে আশ্রমের মহিলারা গুরুদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াছিলেন। বৈকালে তাঁহার বাটীতে আর একদফা নিমন্ত্রণ ছিল। আহারান্তে গুরুদেব, 'বর্ষশেষ', 'ঝুলন', 'পুরাতন ভৃত্য', 'সাধনা' প্রভৃতি কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইয়া ছিলেন।

১০। আজকাল পূজনীয় গুরুদেব সন্ধ্যার সময়ে গল্পগুচ্ছ হইতে তাঁহার ছোট গল্প পড়িয়া শুনাইতেছেন। ইতিমধ্যে একবার 'মুক্তধারা' ও 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' সান্ধ্য-সভায় পঠিত হইয়াছে।

১১। পুস্তকাগারের নূতন অংশের গঠনকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। শমীন্দ্র ও সতীশ কুটীরের মধ্যকার দোতালার মঞ্চগৃহ শেষ হইয়াছে। বিদ্যালয় খুলিলে সেখানে ছেলেরা থাকিতে পারিবে।

আষাঢ়, ১৩২৯
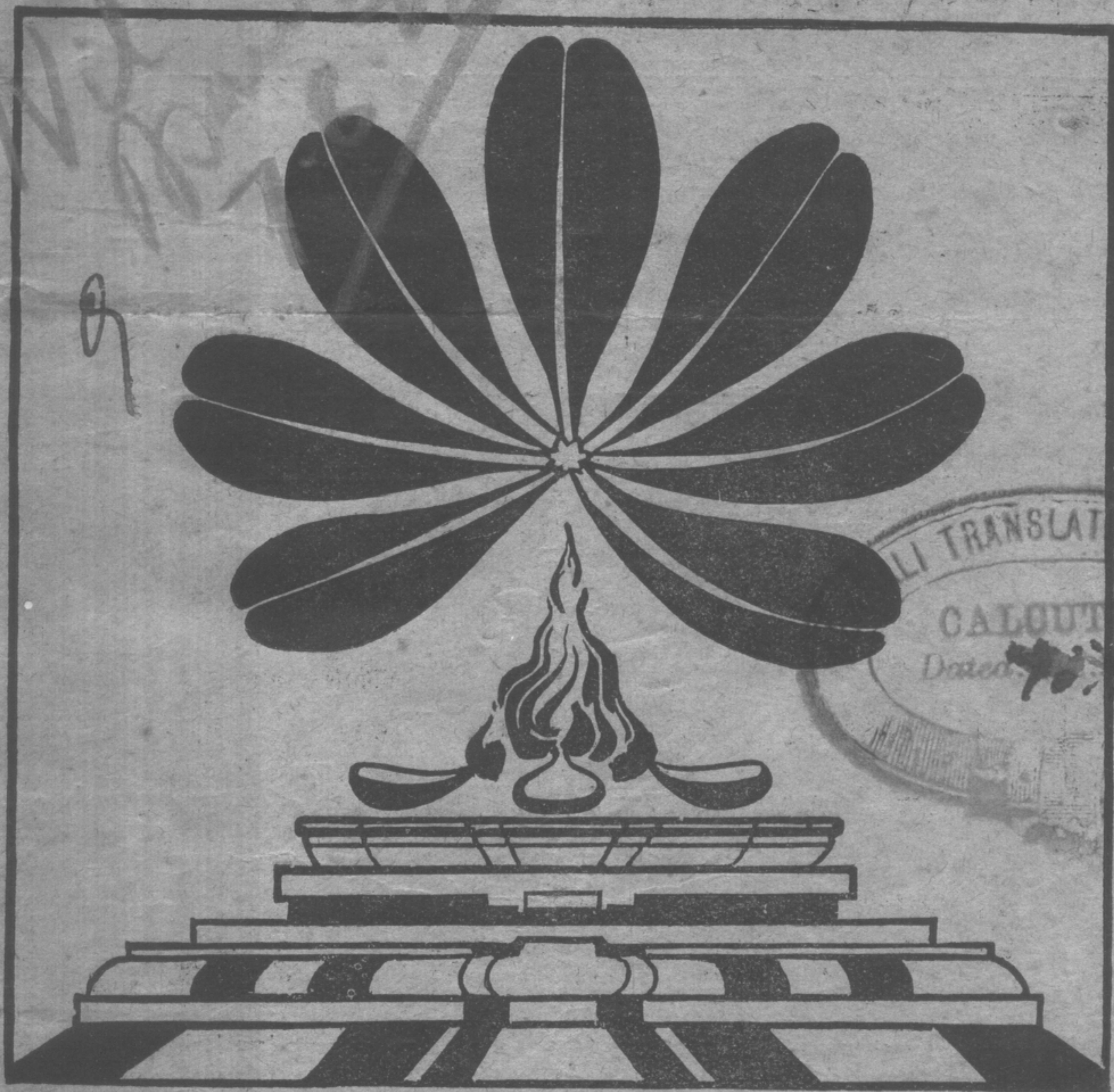
শান্তি নিকেতন

সম্পাদক

শ্রীসন্তোষচন্দ্র মজুমদার

তৃতীয় বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা

বার্ষিক মূল্য
ডাক মাশুল সহ ১॥০ টাকা

শান্তিনিকেতন

"আমরা যেথায় মরি ঘুরে
সে যে যায় না কভু দূরে
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে"

৩য় বর্ষ | আষাঢ়, সন ১৩২৯ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মন্দির

২০শে ফাল্গুন ১৩২৮।

এমন প্রশ্ন কখন কখন শোনা যায় যে ঈশ্বর যদিই বা থাকেন, তিনি ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জগৎ-ব্যাপার চালাচ্ছেন, তাঁকে উপাসনা করবার দরকার কি? এ প্রশ্ন একটা আকস্মিক কৌতুহলের প্রশ্ন নয়, আজকাল যে ভাবে যে প্রণালীতে জ্ঞানের আলোচনা করচে তাতে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক।

একদিন ছিল যখন মানুষ মনে করত ঈশ্বর একজন স্বেচ্ছাপরায়ণ রাজার মত, তাঁকে খুসী করতে পারলে তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়া যায়, নইলে কখন কি কারণে তিনি যে দণ্ড দেন তার ঠিকানা নেই। তখন মানুষ ভয়ে লোভে তাঁর উপাসনা করত। এখনও এমন অনেক লোক আছে যারা মকদ্দমায় জিতবে বা পরীক্ষায় পাশ হবে বা ধন পুত্র লাভ করবে বলে দেবতার স্তবস্তুতি করে,—তাঁর কাছে মানৎ রাখে। এদের মনে উপাসনা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই নেই। তারা যেমন বিশেষ ধনীর কাছে বিশেষ গুণীর কাছে বিশেষ ফল-কামনায় প্রণতি স্বীকার করে, এদের দেবতার উপাসনাও তেমনি। কিন্তু দেবতার স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যখন উদার হয়, যখন বলি তিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন বিশেষ আকার ধারণ করে নেই, তিনি সর্ব্বব্যাপী, এবং তাঁহার বিধান শাশ্বত, তখন বিশেষ ক'রে তাঁর উপাসনার দরকার কি এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। অল্পদিন হ'ল এ প্রশ্ন আমার মনে উঠেছিল।

কিন্তু এ প্রশ্ন করতে হবে নিজেকে, নিজের মনের মধ্যে তলিয়ে এর উত্তর সন্ধান করতে হবে। কোন্ আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্য উপাসনা করি, আমরা ধনের উপাসনা, শক্তির উপাসনা ক'রে থাকি। কেন করি, কেননা এই যে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর আমি, ধনের যোগে, শক্তির যোগে এ

নিজের স্বার্থকতা অনুভব করে। নিজের মধ্যে যে অভাবের পরিচয় পাই, এ অন্নময় জগতে সে অভাব মোচনের রূপ দেখতে পাই। তাই সে আমাকে আকর্ষণ করে। ভয়ের লোভের ঈর্ষার তাড়নায় এই শক্তিভাণ্ডারের দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরতে থাকি। এত দুঃখ এত প্রয়াস আমরা কখনই স্বীকার করতুম না যদি আমার এই লুব্ধ আমি এই ক্ষুব্ধ আমি এই সংসারের নিজের ছোট দিকের সত্যকে না দেখত।

কিন্তু মানুষ ত নিজেকে কেবলমাত্র ছোট বলে মেনে নিতে পারেনি, কেবলমাত্র অভাবের দিক থেকে নিজের পরিচয় পায়নি। তার নিজের মধ্যে এমন কি আছে যার জন্য সে একান্ত স্বার্থসাধনের সংসারে যেন হাঁপিয়ে ওঠে ;—বলে এর থেকে মুক্তিই তার যথার্থ মুক্তি। তার নিজের ছোট পরিচয়ই যদি তার একমাত্র সত্য পরিচয় হ'ত তাহলে তার ত কোন দ্বিধা থাকতোনা ; তাহলে স্বার্থ সাধনের ক্ষেত্র তার সুন্দর বলে বোধ হত।

মানুষের ইতিহাসে এইটে হচ্ছে সবচেয়ে বড় সত্য। এই সত্য যেখানে সেখানে ত অভাব মোচনের কোন কথাই ওঠে না,—সুতরাং সেখানে পশু বলি নেই, সেখানে মানৎ নেই সেখানে বিশেষ কোন একটা বিধি অবলম্বন করে বিশেষ কোন বাহ্য ফললাভের আকাঙ্খাই থাকতে পারে না। সেখানে নিজের ছোট পরিচয়কে উপলব্ধি করাই হচ্ছে উপাসনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমার ছোট আমি অভাবের আমি যে ধনধান্যের ক্ষেত্রকে আশ্রয় করে' বিচরণ করচে, ফলের ভিতরকার কীটের মত যাকে ভোগ করচে, সে যে তার চারদিকেই সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগোচর। আমার বড় আমির, আমার ভাবের আমির আশ্রয় ক্ষেত্রকেও তার চেয়েও বড় করে নিশ্চিত করে যদি অনুভব করি তবেইতো সেই ছোটর বন্ধন থেকে যথার্থ মুক্তি পাই। যতক্ষণ সেই আশ্রয় অস্পষ্ট থাকবে ততক্ষণ দ্বিধায় আন্দোলিত হয়ে মরব। ততক্ষণ ছোটর দুঃসহ দাসত্ব আমাকে সংসারের পথে পথে তাড়না করতে থাকবে।

আমার বড় সত্যের আশ্রয়কে বড় করে উপলব্ধি করবার জন্যে তাঁকে নিঃসংশয়রূপে শ্রদ্ধা করবার জন্যই আমাদের উপাসনা। অভাবের আমি যে সংসারকে অবলম্বন করে থাকে সে যে আমাদের বাইরে—আর ভাবের আমি যে সংসারকে পেলে, সার্থক সে যে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। সেই হৃদয়ের মধ্যে ডুব দিয়ে উপাসনা করতে হয়—যাদের সেই উপাসনা সার্থক হয়—

হৃদা মনীষা মনসাভিক্লিপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি—

হৃদ্গতসংশয়রহিতবুদ্ধির দ্বারা প্রকাশমানরূপে যাঁরা এঁকে জানেন তাঁরা অমৃত হন)

আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের যে সংসার দেখ্‌চি আমাদের কাছে এর জোর খুব বেশী, এর সম্বন্ধে আমাদের সংশয় নেই—তাই এই সংসারের ধর্ম্ম প্রতি নিয়তই আমাদের দেহ মনকে অধিকার করচে। কিন্তু এই হ'ল মর্ত্ত্যধর্ম্ম, অভাবের জগতের ধর্ম্ম,—যেখান থেকে তার অমৃত ধর্ম্ম আপন সত্যতা লাভ করে সেই ভাবের জগৎকে অন্তরের মধ্যে একান্ত নিঃসংশয়রূপে না জান্‌লে কিছুতেই শান্তি নেই ; কারণ যে লাভ চরম সেইখানেই আমাদের শান্তি। সেই জন্যই তো প্রতিদিন বাহির হ'তে চারিদিক হতে মনকে প্রত্যাহরণ করে' অন্তরের মধ্যে তাকে স্থির করে' বলতে হয়—"আবিরাবীর্ম্ম এধি" হে প্রকাশ স্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক্। ধনমান প্রতাপের প্রত্যক্ষতা আমার চারিদিকে যে জাল বিস্তার করেছে তার থেকে আমাকে বাঁচাও। এ সমস্তর চেয়ে আমি যেন তোমাকে অধিক সত্য বলে' জানি। হৃদ্গতসংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারা তোমাকে অন্তরতমরূপে যেন নিত্য প্রকাশমান বলে' উপলব্ধি করি।"

মানুষের মধ্যে পনেরো আনা লোক বলে থাকে,—হাঁ, হাঁ, তিনিই সত্য, ভগবানই সব চেয়ে বড়, আমি যখন অমুক সম্প্রদায়ের লোক তখন একথা তো আমি স্বীকার করেই থাকি।" কিন্তু এ কি কথার কথা? সম্প্রদায়ই কি

সেই সত্য লোক? সম্প্রদায়ও যে ঐ বাহিরের সংসার ভুক্ত—তাইত সেখানেও লোভ ক্ষোভ ঈর্ষা বিবাদ-বিসম্বাদের অন্ত নেই, সেখানেও সত্যের নাম ধরে মিথ্যার আস্ফালন বাতাসকে কলুষিত করে রেখেছে। সেই জন্যেই আত্মার চরম উপাসনা সেই গভীর সেই নিভৃতে যেখানে স্থির হয়ে সে একান্ত বিশ্বাসে বলতে পারে—

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমোলোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ॥

"বলাকা"

(ব্যাখ্যা ও আলোচনা)

বিশ্বভারতীর সাহিত্যক্লাশে আচার্য্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অধ্যাপনার সময় গৃহীত নোট হইতে)

৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

বলাকা (৫)

"মত্ত সাগর দিল পাড়ি"

এই কবিতা যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে লেখা। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যখন কোনো কবিতা মনেতে আকার ধারণ করে তখন তা কোনো নির্দ্দিষ্ট চিন্তাকে অনুসরণ করে না। যখন কোনো একটি ভাবের বীজ চিত্তক্ষেত্রে এসে পড়ে তখন তা ভিতরে গিয়ে আপনা হতে অঙ্কুরিত হয় এবং মানবপ্রকৃতির কতকগুলি খাদ্য পেয়ে সেই অঙ্কুর বিশেষ আকার গ্রহণ করে। তখন ভেবে ভেবে লিখে কবিতাকে আকার দেবার দরকার হয় না। কোনো দার্শনিকতত্ত্বের যেমন ব্যাখ্যা হয় তেমন করে এই কবিতাকে যথার্থভাবে বোঝানো কঠিন ব্যাপার। কোনো গাছ বিশেষ বীজ থেকে যে বিশেষ আকার পরিগ্রহ করে, তার সেই বিশেষত্বের মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য আছে কিন্তু সেই গোপন প্রক্রিয়াটি আমাদের জানা নেই।

সে সময়ে যে যুদ্ধ সুরু হয়েছিল তার চিন্তা আমার মনে কাজ করছিল। তাকে আমার চিত্ত এই ভাবে দেখেছে—যুদ্ধের সমুদ্র পার হয়ে নাবিক আসছেন, ঝড়ে তাঁর নৌকার পাল তুলে দিয়ে। তিনি প্রমত্ত সাগর বেয়ে এই দুর্দ্দিনে কেন আসছেন? কোন্ বড় সম্পদ নিয়ে এবং কার জন্য তিনি আসছেন? এই কবিতায় দুটি প্রশ্নের কথা আমি বলেছি। নাবিক যে সম্পদ নিয়ে আসছেন তা কি এবং নাবিক কোন্ ঘাটে উত্তীর্ণ হবেন? যুদ্ধের সাগর যিনি পার হয়ে আসছেন তিনি কোন্ দেশে কার হাতে তাঁর সম্পদকে দান করবেন?

১ম শ্লোক—যখন চারিদিকে গভীর রাত্রি, সাগর মত্ত, ঝড় বইছে এমন দুর্দ্দিনে নাবিকের কি ভাবনা ছিল যে এমন সময়ে তিনি কূল ছাড়লেন? কি সঙ্কল্প তাঁর মনে ছিল যার জন্য পরম দুর্দ্দিনে নিয়মের দ্বারা সংযত লোকসমাজের কূলকে ত্যাগ করে তিনি মত্ত সাগর পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়েছেন?

দ্বিতীয় শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তরের আভাস আছে। সেই আভাসটা এই যে কোনো একটি গৌরবহীনা পূজারিণী একজায়গায় অজানা অঙ্গনে পূজার দীপ জ্বালিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, যুদ্ধের সাগর পার হয়ে নাবিক সেই পূজা গ্রহণ করবার জন্যে এই প্রচণ্ড ঝড়ে নৌকা ছেড়েছেন। যে অঙ্গনে কারো দৃষ্টি পড়ে না, সেখানে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছে। কিন্তু তাঁকে আসতে হলে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আসতে হবে।

ঝড়ের মধ্যে এই বিবাগীর, ঘরছাড়ার এ কি সন্ধান এবং কাকে সন্ধান? কত না জানি মণিমাণিক্যের বোঝা নিয়ে তিনি নৌকা বেয়ে আসছেন! বুঝি কোনো বড় রাজধানীতে তিনি ধনসম্পদ নিয়ে উত্তীর্ণ হবেন। কিন্তু নাবিকের হাতে যে দেখি একটি মাত্র রজনীগন্ধার মঞ্জরী। তিনি যাঁকে খুঁজছেন তাকে ত তবে মণিমাণিক্য দেবেন না। তিনি অজ্ঞাত অঙ্গনে এক বিরহিনী অগৌরবার কাছে সেই মঞ্জরী নিয়ে আসছেন। এরই জন্য এত কাণ্ড? হাঁ এরই জন্য নাবিকের নিষ্ক্রমণ।

যে রজনীগন্ধার সৌরভ অন্ধকারেই বিস্তৃত হয়, তা সেই অচেনা অঙ্গনের উপযুক্ত। দিনের বেলা সেই সৌরভ

সঙ্গোপনে থাকে কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে তার সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। সেই সৌরভময় ফুল নিয়ে নাবিক বেরিয়েছেন। নূতন প্রভাত আসন্ন, সেই নবপ্রভাতের উপহার নিয়ে নবীন যিনি তিনি আসছেন। যে তপস্বিনী পথের পাশে নূতন প্রভাতে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে অপেক্ষা করছে তাকে সমাদরের মালা পরিয়ে দিতে তিনি বার হয়েছেন। সে রাজপথের পাশে রয়েছে, তার লোককে দেখাবার মত ঘরদুয়ার নেই—তারই জন্য নাবিক অসময়ে সকলের অগোচরে বার হয়েছেন। সেই তপস্বিনীর রুক্ষ অলক উড়ছে, চক্ষের পলক সিক্ত হয়েছে, তার ঘরের ভিত ভেঙ্গে গেছে, সেই ভিতের ভিতর দিয়ে বাতাস হেঁকে চলেছে। বর্ষার বাতাসে তার প্রদীপ কম্পিত হচ্ছে—ঘরের মধ্যে ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে। তার দৈন্যদশার মধ্যে ভয়ে ভয়ে সে রাত কাটাচ্ছে, তার আশঙ্কা হচ্ছে যে বর্ষার বাতাসে তার কম্পমান দীপশিখা কখন নিবে যাবে। সে একপ্রান্তে বসে আছে, তার নাম কেউ জানে না। কিন্তু তারই কাছে নাবিক আসছেন।

আমার উৎকণ্ঠিত নাবিক আজকের দিনেই যে বার হয়েছেন তা নয়। কত শতাব্দী হল তাঁর যাত্রা সুরু হয়েছে, কত দিন থেকে কত কাল-সমুদ্র পার হয়ে তিনি আসছেন। এখনো রাত্রির অবসান হয়নি, প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। যখন তিনি আসবেন তখন কোনো সমারোহ হবে না, তাঁর আগমন কেউ জানতেই পারবেনা। তিনি আসলে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোকে ঘর ভরে যাবে। নূতন সম্পদ কিছু পাওয়া যাবে না, কেবল দৈন্য ঘুচে যাবে। তপস্বিনী যে দারিদ্র্য বহন করছিল তা ধন্য হয়ে উঠবে, শূন্য পাত্র পূর্ণ হয়ে যাবে। তার মনে অনেক দিন ধরে সন্দেহ জাগছিল, সে ভাবছিল যে তার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতীক্ষা করা ব্যর্থ হল বুঝি, কিন্তু তার সে সংশয় ঘুচে যাবে। তখন তর্কের উত্তর ভাষায় মিলবে না, সে প্রশ্নের মীমাংসা নীরবে হয়ে যাবে।

ইতিহাসের বড় বড় বিপ্লবের ভিতর দিয়ে ইতিহাস বিধাতা সাগর পার হয়ে পুরস্কারের বরমাল্য নিয়ে আসছেন। সেই মাল্য কে পাবে? আজ যারা বলিষ্ঠ শক্তিমান্, ধনী, তাদের জন্য আসছেন না। তারা যে ঐশ্বর্য্যের জন্য লালায়িত; কিন্তু তিনি তো ধনরত্নের বোঝা নিয়ে আসছেন না। তিনি প্রেমের শান্তি বহন করে, সৌন্দর্য্যের মালা হাতে করে আসছেন। আজ তো শক্তিমানেরা সে মাল্যের জন্য অপেক্ষা করে বসে নেই, তারা যে রাজশক্তি চেয়েছে। কিন্তু যে অচেনা তপস্বিনী আপন অঙ্গনে বসে পূজা করছে আমার নাবিক রজনীগন্ধার মালা তারই জন্য নিয়ে আসছেন। সে ভয়ে ভয়ে রাত কাটাচ্ছে, মনে করছে তার অজ্ঞাত অঙ্গনে পথিকের বুঝি পদচিহ্ন পড়ল না। সে যখন মাল্যোপহার পেয়ে ধন্য হয়ে যাবে তখন সে বলবে, তোমার হাতের প্রেমের মালা চেয়েছিলাম, এর বেশী কিছু আমি আকাঙ্ক্ষা করি নি। ধনধান্যে আমার স্পৃহা ছিল না। এই রিক্ততার সাধনা যে করেছে, এই কথা যে বলতে পেরেছে, সে দুর্ব্বল অপরিচিত দরিদ্র হোক্ নাবিক সেই অকিঞ্চনের গলায় মালা পরিয়ে দেবেন। এরই জন্য এত কাণ্ড, এত যুগ যুগান্তরের অভিসার! হাঁ, এরই জন্য। সকল ইতিহাসের এটাই অন্তর্নিহিত বাণী।

গত মহাযুদ্ধে একদল লোক অপেক্ষা করে বসেছিল যে যুদ্ধাবসানে তারা শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু আরেক দল লোক পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য চেয়েছিল; তারা অখ্যাতনামা তপস্বী। পৃথিবীর এই বিষম কাণ্ডকারখানার মধ্যে তারা সমস্ত ইতিহাসের গভীর ও চরম সার্থকতাকে উপলব্ধি করেছে, বিশ্বাস করেছে। বিশ্বে যারা পরাজিত, অপমানিত; তারা মনুষ্যত্বের চরম দানের পথ চেয়েই আপনাকে সান্ত্বনা দিতে পারে। সমস্ত জগতের ইতিহাসের গতি তাদের মঙ্গলের আদর্শের বিপরীত পথে চলেছে কিন্তু তবুও তারা প্রদীপ যদি না নেবায়, তপস্যায় যদি ক্ষান্ত না হয়, অপেক্ষা যদি করে থাকে, তবে তখন সেই নাবিক এসে তাদের ঘাটে তরী লাগাবেন আর তাদের শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেবেন।

রোম্যাঁ রোলাঁ ও আঁরি বারব্যুস

ফ্রান্সের চিঠি।

১লা বৈশাখ ১৩২৯

শ্রীচরণকমলেষু—

অনেকদিন পরে আপনাকে লিখতে বসেচি; আমার এ চিঠি নববর্ষে আপনার আর একটি নবজন্মদিনে পৌছুবে; আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি।

এবারকার প্রধান খবর Romain Rollandর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই পরিচয়ের সঙ্গে যেন প্রথম মনে হল ইউরোপে আসা ও ফ্রান্সে একবছর থাকা সার্থক হল: জীবনের সব গভীর পরিচয়ই যেমন অতর্কিতে আসে এটিও তেমনি এল: রোলাঁর ভগ্নি মাদ্‌লেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর জানতে চান আমার বর্ত্তমান অধ্যাপক Jules Blochএর কাছে। তিনি আমার নাম ধাম রোলাঁদের পাঠান তার ফলে তাঁদের বাড়ীতে আপনার ও গান্ধির আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে আমায় কিছু কিছু আলোচনা করতে হয় এবং বর্ত্তমান ভারত সমস্যা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর দিতে হয়; গান্ধীকে পাগল প্রমাণ করবার সাধু প্রয়াস ইংরেজ পরিচালিত কাগজে যতই প্রকট হয়ে উঠছে ফরাসী উদার নৈতিকদের মধ্যে বিশেষতঃ রোলাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে সত্য গান্ধীকে আবিষ্কার করবার—ভারতের সমস্যাটি বুঝবার আগ্রহ ততই বেড়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে তাই আমার মত নগণ্য একজন মানুষও শুধু ভারতবাসী বলেই এঁদের দলে ভিড়তে পারলে।

ইতিমধ্যে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল; যে-ফরাসী উদার-নৈতিকদল এতদিন একত্র হয়ে—রাষ্ট্রীয়নৈতিকদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছিলেন—তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হল; একদল দাঁড়িয়েছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আঁরিবারব্যুস এর (Henri Barbusse) পাশে আর একদল Rollandর পাশে! দুইদলই স্বীকার করেন যে সমাজকে উদ্ধার করতে হবে রাষ্ট্র সঙ্কট থেকে; মানুষকে রক্ষা করতে হবে কলের পেষন থেকে। কিন্তু Barbusseএর দল একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন, কলের সঙ্গে লড়তে হলে কল গড়তে হবে—আপনা থেকে যদি গড়ে না ওঠে জবরদস্তি করেও গড়া দরকার এবং এ জবরদস্তি যাঁরা না মানেন তাঁরা কবি বা ভাবুক হতে পারেন, সংস্কারক নন—সুতরাং সংস্কারমার্গের বাইরে তাঁদের স্থান।

এই ধরনের ভাবার বিরুদ্ধে রোলাঁ প্রথম একবার ধীর প্রতিবাদ করিলেন L'Art libre পত্রিকায়, তার উত্তর বারব্যুসের দল L'Humanite বলে কাগজে দিলেন; তার ফলে ১লা এপ্রেলের Clarte কাগজে Rolland Barbusseএর উত্তর প্রত্যুত্তর ছাপা হয়েছে: বারব্যুসের লেখার মধ্যে জুলুমের সার্থকতাটা আরও বেশী প্রকট হয়েছে এবং সেই সঙ্গে রোলাঁ তাঁর বক্তব্যটি একখানি অপূর্ব্ব চিঠিতে পরিস্ফুট করেছেন; তাঁর মতে কলের সঙ্গে সংগ্রামে কল গড়তে যাওয়া—সে যে-কোন দোহাই দিয়েই হোক—আসলে হচ্ছে কলের কাছে জীবনের পরাভব স্বীকার। জার্ম্মানীর Poison gas এ জার্ম্মানীকে হারান হল বটে কিন্তু Germanism অজেয় রয়ে গেল! তা ছাড়া জুলুম জিনিষটা যত বড় মহৎ উদ্দেশ্যই আশ্রয় করে থাক না কেন—সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ; এই জুলুমের পরওয়ানার উপর স্বার্থত্যাগের ছাপ যত বড় অক্ষরেই দেওয়া থাক না কেন সেটা জুলুমই থেকে যায় সুতরাং সেখানে মনুষ্যত্বের পরাভব স্বীকার করা হচ্ছে; যে স্বার্থত্যাগ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয় তা মানুষকে বড় করে না—খর্ব্ব করে। আপাত ফললাভের লোভ যতই দেখান যাক না কেন কোনও সমাজনৈতিকই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূলে আঘাত করে সমাজকে স্থায়ী-ভিত্তি দিতে পারেন না। সুতরাং প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে মানুষের মনকে মুক্তি দেওয়া; তবেই তার ইচ্ছা সত্যকে আশ্রয় করতে, তার হৃদয় কল্যাণকে বরণ করতে শিখবে।

এখন ফরাসী ভাষায় তাঁর মত মনীষীর কথাও বুঝতে পারি

বলে কি আনন্দ হয় কি করে বোঝাব! অনেক সুকৃতির ফলে আপনার ভিতর দিয়ে রোলাঁর সঙ্গে পরিচয় হল; এঁর সমস্ত বই একধার থেকে পড়ে যাচ্ছি···দেশে ফিরে প্রথম কাজ রোলাঁর চিন্তা ও আদর্শ দেশের লোকের সামনে ধরা এবং এঁর বইএর প্রচার করা; যথার্থ বিশ্বপ্রেমিক মানুষ ইয়োরোপে এই প্রথম দেখলুম। অথচ চারিদিক থেকে এর উপর আক্রমণ। শুধু অত্যুগ্র স্বাজাতিক ফরাসী দেশবাসী নয়—রোলাঁর সমধর্ম্মী সহকর্ম্মীরা পর্য্যন্ত তাঁকে কতটা ভুল বুঝছেন তা দেখছি!

শিল্পী ত মানুষ বটে—তাই এই ভুল বুঝবার নিষ্ঠুরতা বোধ হয় সব চেয়ে এঁদের বাজে; Rollandকে দেখে মনে হল যেন একটা সাময়িক অবসাদ এসেছে—আমার মত কীটানুকীট তাঁকে সান্ত্বনা দেবার স্পর্দ্ধা রাখে না, তবু একটি কাজ না করে থাকতে পারলুম না; 'বলাকা' থেকে আপনার 'যাত্রী' কবিতাটি অনুবাদ করে তাঁকে উপহার দিয়ে এসেছি; অনুবাদ শুনে আমায় আসল বাংলা কবিতাটি আবৃত্তি করতে বললেন—সৌভাগ্যক্রমে কবিতাটি মুখস্থ ছিল; শোনবার পর কিছুক্ষণ চুপ করে রোলাঁ বলে উঠলেন "কবির এইদিকটা অনুবাদের ভিতর দিয়ে পাওয়া সব সময় সহজ হয় না; যাত্রীর ধরনের লেখা তাঁর এ পর্য্যন্ত দেখেছি বলে মনে হয় না—এ যেন Beethovenএর sublime Symphony···"

বেথোভেনের জীবনীলেখক কি মনে করে একথা বললেন ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরে এলুম।

প্যারিসে থাকা বোধ হয় রোলাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তিনি শুনছি স্থায়ীভাবে সুইটজারল্যাণ্ডে বাস করবেন; আপনার জন্মদিন আসছে এবং আপনাকে আমি চিঠি লিখতে যাচ্ছি জেনে রোলাঁ এবং তাঁর ভগ্নি তাঁদের শুভইচ্ছা ও প্রীতিনমস্কার আপনাকে পাঠাতে বলেছেন; আশা করি আপনার শরীর বেশ ভাল যাচ্ছে এবং বিশ্বভারতীর কাজ বেশ এগিয়ে চলেছে। আচার্য্য লেভি নেপাল থেকে ফিরে আবার আশ্রমে আসছেন কি? তাঁরা ভারতে কতদিন আছেন? আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। ইতি

স্নেহের কালিদাস

গান

১

কখন বাদল—ছোঁওয়া লেগে
মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি
সবুজ মেঘে মেঘে।
ঐ ঘাসের ঘন ঘোরে
ধরণীতল হল শীতল চিকন আভায় ভরে,
ওরা হঠাৎ গাওয়া গানের মত এল প্রাণের বেগে।
ওরা যে এই প্রাণের রণে মরুজয়ের সেনা।
ওদের সাথে আমার প্রাণের প্রথম যুগের চেনা।
তাই এমন গভীর স্বরে
আমার আঁখি নিল ডাকি ওদের খেলাঘরে।
ওদের, দোলা দেখে প্রাণে আমার
দোলা ওঠে জেগে॥

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

২

আজি বর্ষারাতের শেষে
সজল মেঘের কোমল কালোয়
অরুণ আলো মেশে।
বেণুবনের মাথায় মাথায়
রং লেগেচে পাতায় পাতায়,
রঙের ধারায় হৃদয় হারায়
কোথা যে যায় ভেসে।
এই ঘাসের ঝিলিমিলি
তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন
একতালে যায় মিলি।

মাটির প্রেমে আলোর রাগে
রক্তে আমার পুলক লাগে,
বনের সাথে মন যে মাতে
ওঠে আকুল হেসে ॥

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

৩

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণায় কি সুর বাঁধারে।
ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে
তালের পাতা মুখর করে তোলে,
উতল হাওয়া বেণুশাখায় লাগায় ধাঁদারে।
ছায়ার তলে তলে জলের ধারা ঐ
হের দলে দলে নাচে তাথৈ থৈ।
মন যে আমার পথ-হারানো সুরে
সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,
শোনে যেন কোন্ ব্যাকুলের করুণ কাঁদারে।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

আশ্রম সংবাদ

কলিকাতা আশ্রমিক সঙ্ঘ।

নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও 'কলিকাতা আশ্রমিক সঙ্ঘে'র এখন একাদশ বৎসর চলিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য কলিকাতাস্থ প্রাক্তন আশ্রমবাসীদের মধ্যে যোগ রক্ষা করা ও আশ্রমের আদর্শটিকে সকলের মধ্যে জাগাইয়া রাখা। এই সঙ্ঘের গত দুই বৎসরের কার্য্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

* * * *

জুলাই মাসে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি বৎসর সেই সময়ে কলিকাতায় নবাগত আশ্রমবাসী-গণকে লইয়া নূতন কর্ম্মকর্ত্তাদের নির্ব্বাচিত করিয়া আশ্রমিক সঙ্ঘ তাহার কাজ আরম্ভ করিয়া থাকে। গত পূর্ব্ব বর্ষের (জুলাই, ১৯২০-জুলাই, ১৯২১) প্রারম্ভে সঙ্ঘের কাজ খুব জমিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ঐ বর্ষের ডিসেম্বর হইতে কলিকাতার নানা গোলমালের জন্য তাহার কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই বর্ষের কর্ম্মকর্ত্তাগণের নাম—সম্পাদক, জিতেন্দ্র ভট্টাচার্য্য; সহকারী সম্পাদকদ্বয়, ভুবনেশ্বর নাগ ও শশধর সিংহ; কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—সম্পাদক, বীরেন্দ্র বসু, ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সুহৃদ মুখোপাধ্যায় ও কালীমোহন ঘোষ। যে নয়টি অধি-বেশন হইয়াছিল, তাহাতে গড়ে ১৭ জন করিয়া সভ্য উপস্থিত ছিলেন। প্রায় প্রতি সভাতেই শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞান, মহাপুরুষের জীবনী প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ হয় এবং গুরুদেবের বিদেশের পত্র ও আশ্রমের পত্র পঠিত হয়।

* * * *

জুলাই ১৯২১ হইতে বর্ত্তমান বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। এই বর্ষের নির্ব্বাচিত কর্ম্মকর্ত্তাগণ—সম্পাদক, বিজয় বাসু; সহকারী সম্পাদকদ্বয় সুধাংশু সরকার ও সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ—সত্যরঞ্জন বসু, পত্রিকা বিভাগ; বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, ক্রীড়া বিভাগ; শিবদাস রায়, তত্ত্বাবধান বিভাগ, অমিয় ভট্টাচার্য্য নির্ব্বাচিত সভ্য। বর্ত্তমান বর্ষে এ পর্য্যন্ত পাঁচটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

* * * *

১৪ই আগষ্টের অধিবেশনে স্থিরীকৃত হয় যে গুরুদেবের 'শিক্ষার মিলন' বক্তৃতাটি আশ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোগে হইবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে সঙ্ঘ গুরুদেবের শিক্ষাবিষয়ক দ্বিতীয় বক্তৃতাটির আয়োজন করিয়াছিল। ২৯শে সেপ্টেম্বর জিতেন্দ্র

ভট্টাচার্য্য 'শিক্ষার মিলন' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহন করেন। ঐ সভায় সূর্য্য চক্রবর্ত্তী ও বীরেন সেন এ বৎসর ফুটবল ম্যাচে আশ্রমের 'টিমের' কার্য্য-কলাপ বর্ণনা করেন। প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত একটী শীল্ড ও একটী কাপ সভায় প্রদর্শিত হয়। ২৮ শে নভেম্বর জ্যোতিষ রায়কে জার্ম্মানী যাত্রার পূর্ব্বে বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়। অরুণচন্দ্র সেন এই সভায় সভাপতি হন। শ্রীমান জ্যোতিষকে সজ্বের পক্ষ হইতে কতকগুলি পুস্তক উপহার দেওয়া হয়। জ্যোতিষ চলিয়া যাওয়াতে সজ্বের অনেক ক্ষতি হইল। কারণ নানা দুর্য্যোগে বিশেষতঃ ১৯১৯-২০ সালে তিনি সম্পাদকরূপে অতি উৎসাহ ও দক্ষতার সহিত সজ্বকে বাঁচাইয়া রাখেন এবং তিনি ইহার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই সভায় ৮ই পৌষের সভায় সভাপতি করিবার জন্য কয়েক-জনের নাম প্রস্তাবিত হয়। ৭ই পৌষের অনতিপূর্ব্বে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আর একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে জিতেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভারতের অর্থবিনিময় সমস্যা বিষয়ক একটি সারগর্ভ ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

* * * *

বলা বাহুল্য এই সভাগুলিতে সামাজিকতার দিকটিও বজায় থাকে অর্থাৎ এখানকার সুগায়কগণ সঙ্গীতের দ্বারা সকলকে আনন্দদান করেন এবং মধুরেণ সমাপয়েৎ এই নীতি অনুসারে সভাশেষে মধ্যে মধ্যে প্রীতিভোজনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। আশ্রমিক সজ্ব হইতে পরিচালিত হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'যাত্রী' কিছু দিন হইতে তাহার যাত্রা বন্ধ করিয়াছে। আশা করি ইহা পুনরায় প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করা হইবে।

* * * *

গত ৩০শে জানুয়ারী সেক্সপীয়র এসোসিয়েসনের উদ্যোগে 'প্রাচ্যতত্ত্ব সম্মিলনের সদস্যগণের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে বঙ্গেশ্বর-প্রাসাদে 'দি পোষ্ট অফিস' ('ডাকঘর') এর অভিনয় হইয়াছিল। অমল, সুধা, মোড়ল, মাধব, কবিরাজ ও বালকের দল, ইহাদের অভিনয় কয়েকজন ইয়োরোপীয় এবং অন্যান্য পাত্রগণের অভিনয় কয়েকজন বাঙালী করিয়াছিলেন। একটি ইংরাজ বালিকা অমল সাজিয়াছিল।

* * * *

'ডাকঘর' আজকাল পাশ্চাত্যদেশে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দেশে ইহার অভিনয় হইতেছে গত সংখ্যায় তাহার কিছু সংবাদ আমরা পাইয়াছি। কবি কিছুদিন পূর্ব্বে একদিন 'বলাকা'র ক্লাশে বলেন যে জার্ম্মানিতে তিনি ডাকঘরের যে অভিনয় দেখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ডাকঘর নাটকটিকে তাহারা একটি রোমান্সের সামিল করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু এই নাটকের মধ্যে একটি মূলতত্ত্ব আছে। সংসার প্রতিদিনের অভ্যাসের বন্ধনে মানুষকে বন্দী করিয়া রাখে। তাহার চারিদিকে যাহা জমিয়া উঠে মাধবের মত হিসাবী লোক তাহাকে প্রাচীর দিয়া বাঁধিতে চায়। কিন্তু অসীমের আহ্বানে আত্মা এই জড়প্রথাকে সঞ্চয়ের বন্ধনকে মুক্ত করিয়া দিতে চায়। কবি বলেন যে, আত্মার এই মুক্তির ক্রন্দন ডাকঘরের অন্তরের সুর। বার্লিনে কবির সাক্ষাতে ডাকঘরের যে অভিনয় হইয়াছিল তিনি বলেন যে, তাহা হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং দর্শকেরা তাহা স্তব্ধ হইয়া শুনিয়াছিলেন। একটি জার্ম্মান কাগজে এই নাটকের গূঢ় ভাবটির একটি চমৎকার সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। [ফেব্রুয়ারীর 'মডার্ণ রিভিউয়ে ইহার অনুবাদ আছে]

এবার সমস্ত গ্রীষ্মের ছুটিটাই পূজনীয় গুরুদেব এখানে কাটাইলেন। তিনি ছুটিতে অনেকগুলি বর্ষার গান রচনা করিয়াছেন, গত বৎসরের মত এবারও কলিকাতায় বর্ষামঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। তিনি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ছুটির মধ্যেও আশ্রমে কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির সমাগম হইয়াছিল।

কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয় সপরিবারে সমস্ত ছুটিই এখানে কাটাইয়াছেন।

বিশ্বভারতীর কলাবিভাগের ছাত্র শ্রীমান হীরাচাঁদ ডুগারের বন্ধু জিয়াগঞ্জের শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র নাহাটা আশ্রম দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি অল্পদিন হইল বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এই স্থানটি তাঁহার এতদূর ভাল লাগিয়াছে যে তিনি এইখানেই বাস করিবার জন্য একখানি বাড়ী করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা বিশ্বভারতী নানা বিষয়ে সহায়তা লাভ করিবে আশা করা যাইতে পারে।

আমেরিকা-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার আমেরিকীয় স্ত্রীসহ কয়েক দিন আশ্রমের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি বহুবৎসর আমেরিকায় ছিলেন। সেখানে ইংরেজী লেখক ও বক্তারূপে তাঁহার খ্যাতি আছে।

এখানে আজকাল প্রায় বৃষ্টি হইতেছে। এবার কাল-বৈশাখীর ঝড়ে আশ্রমের পাকশালার টিনের ছাদ অনেকটা উড়িয়া গিয়াছিল—এবার পাকা ছাদ হইতেছে। প্রায় প্রত্যেক বৎসরই ঝড়ে বিদ্যালয়ের বাড়ীগুলির বড় ক্ষতি হয় বলিয়া যথেষ্ট আর্থিক লোকসান সহিতে হয়। গ্রন্থাগারের নূতন ইমারৎ হইবার পূর্ব্বেই বৃষ্টি এত শীঘ্র এবং এত বেশী আসিয়া পড়িল যে পুস্তকগুলির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল—কিন্তু গ্রন্থাগারিক মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে নাই।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আনাসাকী কয়েকখানি বহুমূল্য দুর্লভ চীনা ও জাপানী পুস্তক গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন। সাংহাই হইতে আমরা সমগ্র চীন ত্রিপিটক (প্রায় চারশত গ্রন্থ) উপহার পাইয়াছি। ফরাসী দেশ হইতে বিশ্বভারতীর বন্ধুগণ বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধীয় বহুপুস্তক পাঠাইয়াছেন। জার্ম্মানীতে গুরুদেবের জন্মদিনের উৎসবে যে সব পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, সেগুলিও হাম্বুর্গ হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

বিশ্বভারতীতে জৈন সাহিত্য ও ধর্ম্ম আলোচনার জন্য জিয়াগঞ্জের শ্রীযুক্ত অমরচাঁদ বোথরা, কলিকাতার শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহার ও তদীয় পুত্র শ্রীমান পৃথ্বী সিং এবং ভাওনগর, কাঠিবারের 'যশোবিজয় গ্রন্থমালার' প্রকাশক অনেকগুলি জৈন গ্রন্থ দান করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

গ্রীষ্মকালে এখানে বড় জলাভাব হয় বলিয়া আশ্রমে দেড় শ' ফুট এবং সুরুলে প্রায় দু শ' ফুট মাটী মৃত্তিকা-ভেদন যন্ত্রের সাহায্যে খনন করা হইয়াছে। কিন্তু নীচে পাথরের মত শক্ত মাটী বলিয়া কাজ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। খনন করিবার যন্ত্রটি দিবারাত্রি চালাইবার জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও ছাত্র অনেকেই অক্লান্তভাবে দিন রাত্রি কাজ করিয়াছিলেন। আশা করা যায়, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টায় আমরা অচিরেই যথেষ্ট জল পাইব। পূজনীয় গুরুদেব কর্ম্মীদের উৎসাহিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত গানটি রচনা করিয়াছেন।

এস এস, হে তৃষ্ণার জল,
ভেদ করি কঠিনের ক্রূর বক্ষতল
কল কল ছল ছল।

এস এস উৎস স্রোতে
গূঢ় অন্ধকার হ'তে
এস হে নির্ম্মল,
কল কল ছল ছল।

রবিকর রহে তব প্রতীক্ষায়
তাহারি সোনার তান
তোমাতে জাগায় গান,
এস হে উজ্জ্বল,
কল কল ছল ছল।

হাঁকিছে অশান্ত বায়
"আয়, আয়, আয়" সে তোমায় খুঁজে যায়।

বাদাম, বিলাতি বেগুন, বরবটি ও মূলার বীজ লাগাইয়াছে।

সিউড়ির কৃষি-বিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত সন্তোষবিহারী বসু প্রতি মাসে সাত দিন সুরুলে অবস্থান করিয়া কৃষি-বিভাগের শিক্ষাদানে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কৃষি-বিভাগের শ্রীমান ধীরানন্দ রায় ও কলাবিভাগের শ্রীমান মসোজিকে ছুটির মধ্যে জব্বলপুরে Scout master হইবার শিক্ষালাভ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা সেখানকার অধ্যক্ষের নিকটে বেশ খ্যাতি লাভ করিয়া উপরোক্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ছুতারের কাজেরও ক্রমোন্নতি হইতেছে। সম্প্রতি ছাত্রেরা নূতন বৃষ্টি পাইয়া কয়েক দিন চাষের কাজে ব্যস্ত আছে—তাহাদের জমির কাজ একটু কমিলেই তাহারা অন্যান্য কাজ আরম্ভ করিতে পারিবে।

অনাহার ক্লিষ্ট রুশীয় মনস্বীদের সাহায্যার্থে আবেদন পত্র।

অক্সফোর্ডের International Law এর বিখ্যাত প্রফেসর P. Vinogradoff আচার্য্য রবীন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত পত্র খানি পাঠাইয়াছেন :—

"আট বৎসর পূর্ব্বে যখন কলিকাতায় আপনার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল তখন আমি ভাবিতেই পারি নাই যে আমাকে আমার হতভাগ্য রুশীয় স্বদেশবাসীদের হইয়া আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে।

সেই মিলনের পর আমার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, যে ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের তাড়নায় জর্জ্জরিত, তাহার প্রতিনিধি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি একমাত্র আপনি।

এই দুর্ভিক্ষ এবং অত্যাচারের কবল হইতে রুশের মৃতপ্রায় মনীষী এবং ভাবুক সম্প্রদায়কে বাঁচাইবার জন্য আমি আপনার ন্যায় অন্যান্য ভাবুক ও জনহিতৈষী লোকদের নিকট আবেদন জানাইতেছি। ইঁহাদের মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

অসংখ্য অনশনক্লিষ্ট কৃষকদের তরফ হইতে সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং জগতের সকল দেশেরই সদাশয় লোকেরা তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য দানের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই সমস্ত জননায়ক, চিকিৎসক এবং সকল বিভাগেরই শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দেশীয় সহকর্ম্মীদের নিকট হইতে বিশেষরূপে সাহায্য পাইবার যোগ্য।

রুশিয়ায় ইঁহাদের সংখ্যা কোন দিনই বেশী ছিল না কিন্তু ইঁহাদের দল ধীরে ধীরে পুষ্ট হইতেছে এবং লোকসেবা ও অসহায় জনসাধারণের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করার কার্য্যে তাঁহারা ক্রমশ অগ্রসর হইতেছেন। রুশিয়ার অন্তর্বিপ্লবে ইঁহাদের অনেকেই মরিয়াছেন ইঁহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ নিষ্ঠুরভাবে তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিতেছে ভারতবাসীরা আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন এবং আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন এই আশা করিয়া তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনার কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে কিরূপ বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছেন তাহা নিম্ন লিখিত কয়েকটি ঘটনা পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহারা যখন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করিতেন এবং দুর্ভিক্ষের জন্য রশদ পাইতেন তখন তাঁহাদের অবস্থা যতই শোচনীয় থাকুক না কেন কিন্তু সম্প্রতি তাহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে। যখন হইতে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুসারে ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং বাণিজ্যের অধিকার লোপ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন তখন হইতেই তাঁহারা রাজকর্ম্মচারীবর্গের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যা সংক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহার ফলে বহু সংখ্যক মস্তিষ্কজীবীদের পথে বাহির হইতে হইল এমন কি তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনেরও

কোন উপায় রহিল না। সরকার হইতে প্রাপ্ত নাম মাত্র বেতনে অকুলন হওয়ায় তাঁহাদের গৃহের অধিকাংশ জিনিষই তাঁহারা পূর্ব্বে বিক্রয় করিয়াছেন এবং সম্প্রতি পেট্রোগার্ডে, মস্কোতে ও ওড়েসারে, খারকেকে এবং কিয়েফ ইত্যাদিতে এমন সহস্র সহস্র মস্তিষ্কজীবী আছেন যাঁহারা কোন কাজ পাইতেছেন না, তাঁহাদের বিক্রয় করিবার মতও কোন জিনিষ পত্র নাই এবং এমন কি সত্য সত্যই তাঁহাদের দল অনাহারে ও রোগে দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

নিম্নে রুশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত পত্র সমূহের কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল।

একটি বৃহৎ শিক্ষা-কেন্দ্র হইতে যে পত্র পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে এইরূপ লেখা আছে।

৭ই জানুয়ারী ১৯২২ আমি সম্প্রতি X.-Y,-Z-এর সহিত নগর সভার কাজে নিযুক্ত হই। ইঁহারা সকলেই বিখ্যাত স্থপতি; ইঁহারা সহরের সব চমৎকার বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কোন রকমে ছাতাপড়া আধসের জইশস্য কিংবা একটু সাবান সংগ্রহ করিতে কি পরিশ্রমই না করিতে হইত। কারণ দিনে আমরা এক পোয়া মাত্র রুটি বেতন রূপে পাইতাম। এখন আমরা তাহাও পাই না। A,-Bর হাতে এমন কালী পড়িয়াছে এবং ভয়ঙ্কর ভাবে তাঁহার হাত ফুলিয়াছে যে তাঁহার দিকে কিছুতেই তাকান যায় না (A,-B-সহরের পরোপকারীদের মধ্যে এক-জন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং তিনি নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার) উকিলদের অবস্থা সকলের অপেক্ষা শোচনীয়। বিখ্যাত বারিষ্টার N-যখন শেষবারে আমার কাছে মোটে এক আউন্স রুটির দাম ৫০ রুবল্ ধার করিবার জন্য নগরসভায় আসিয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তিনি ছেঁড়া ন্যাকড়া পরিয়া আসিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না এবং তিনি তাঁর ঠাণ্ডায় জমা ও ফোলা হাত দুটি যখন উত্তপ্ত ষ্টোভের উপর রাখিলেন তখন তাঁহার উত্তাপ অনুভব করিবার শক্তি পর্য্যন্তও ছিল না।

আর একটি শিক্ষাকেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত পত্রাংশ উদ্ধৃত হইল।

অধ্যাপক A-এবং তাঁহার পত্নী খাদ্য সংগ্রহের জন্য এমন কি তাঁহাদের খাট বিছানা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছেন, অনাবৃত মেজেয় ঘুমাইয়া তাঁহারা মৃত্যু অপেক্ষা করিতেছেন। Bর অবস্থাও ঐরূপ C-প্রেতাত্মার মত শীর্ণকায় ও বিবর্ণ হইয়াছেন। তিনি তাঁহার গৃহের শেষ দ্রব্যটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করিতেছেন। Kostandi অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইনি রুশের একজন বিখ্যাত চিত্রকর A,-B,-Cরাও তাই।

আপনি এবং আপনার বন্ধুবর্গ যদি এই হতভাগ্য লোক-দের সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আপনি রুশিয়ার মনীষীদের সাহায্যকল্পে যে পরিষৎ নির্ব্বাচিত হইয়াছে তাহার নিকট আপনাদের দান পাঠাইয়া দিবেন। প্যারিসে ইহার একটি কেন্দ্র আছে। ইহার ঠিকানা (118 rue de la Faisan derie) নিম্নলিখিত জনহিতৈষী ব্যক্তিগণকে লইয়া উক্ত সমিতি গঠিত হইয়াছে—P. Milu-koff সভাপতি J. Tschaikovsky, D. Merejkovsky, J. Bunin, P. Vinogradoff, L. Rosenthal ধনরক্ষক M, Zetlin সম্পাদক।

আপনি যদি এই সমিতিতে যোগদান করেন তাহা হইলে তাহা আমরা খুব গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিব। আমরা আশা করি যে ভারতে আপনি এই সমিতির সংশ্লিষ্ট আরেকটি সমিতি গঠনের ভার গ্রহণ করিবেন।

আপনি আপনার দান এই ঠিকানায় পাঠাইবেন Monsieur L. Rosenthal, 6 Avenue Ruysdal Paris

আপনার অকৃত্রিম

P. Vinogradoff"

ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতে চান তাঁহারা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাহা পাঠাইবেন, তিনি পরে প্যারিসে ধনরক্ষকের নিকট তাহা প্রেরণ করিবেন।

শান্তিনিকেতন প্রেসে রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।